দর্প-চূর্ণ ও আঁধারে আলো

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মেজদিদি

১

কেষ্টর মা মুড়ি-কড়াই ভাজিয়া, চাহিয়া চিন্তিয়া, অনেক দুঃখে কেষ্টধনকে চোদ্দ বছরেরটি করিয়া মারা গেলে, গ্রামে তাহার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। বৈমাত্র বড়বোন কাদম্বিনীর অবস্থা ভাল। সবাই কহিল, যা কেষ্ট, তোর দিদির বাড়ীতে গিয়ে থাক্‌গে। সে বড় মানুষ, বেশ থাকবি যা।

মায়ের দুঃখে কেষ্ট কাঁদিয়া কাটিয়া জ্বর করিয়া ফেলিল। শেষে ভাল হইয়া, ভিক্ষা করিয়া শ্রাদ্ধ করিল। তার পরে ন্যাড়া মাথায় একটি ছোট পুঁটুলি সম্বল করিয়া, দিদির বাড়ী রাজ-হাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দিদি তাহাকে চিনিতেন না। পরিচয় পাইয়া এবং আগমনের হেতু শুনিয়া একেবারে অগ্নি-মূর্ত্তি হইয়া উঠিলেন। তিনি নিজের নিয়মে ছেলে-পুলে লইয়া ঘরসংসার পাতিয়া বসিয়াছিলেন—অকস্মাৎ এ কি উৎপাত!

পাড়ার যে বুড়ো মানুষটি কেষ্টকে পথ চিনাইয়া সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাকে কাদম্বিনী খুব কড়া কড়া দুচার কথা শুনাইয়া দিয়া কহিলেন, ভারি আমার মাসিমার কুটুমকে ডেকে এনেছেন, ভাত মারতে! সৎমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তিনি ত জ্যান্তে একদিন খোঁজ নিলেন না, এখন ম'রে গিয়ে

ছেলে পাঠিয়ে তত্ত্ব করেছেন! যাও বাপু, তুমি পরের ছেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাও—এ সব ঝঞ্ঝাট আমি পোয়াতে পার্‌ব না।

বুড়া জাতিতে নাপিত। কেষ্টর মাকে ভক্তি করিত, মাঠাক্‌রুণ বলিয়া ডাকিত। তাই এত কটূক্তিতেও হাল ছাড়িল না। কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিল, দিদিঠাক্‌রুণ, লক্ষ্মীর ভাঁড়ার তোমার। কত দাস-দাসী, অতিথি-ফকির, কুকুর-বেড়াল এ সংসারে পাত পেতে মানুষ হয়ে যাচ্চে, এ ছোঁড়া ছ্মুঠো খেয়ে বাইরে প'ড়ে থাকলে তুমি জানতেও পার্‌বে না। বড় শান্ত সুবোধ ছেলে দিদিঠাক্‌রুণ! ভাই ব'লে না নাও, দুঃখী অনাথ বামুনের ছেলে ব'লেও বাড়ীর কোণে একটু ঠাঁই দাও দিদি।

এ স্তুতিতে পুলিশের দারোগার মন ভেজে, কাদম্বিনী মেয়েমানুষ মাত্র! কাজেই তিনি তখনকার মত চুপ করিয়া রহিলেন। বুড়া কেষ্টকে আড়ালে ডাকিয়া কটা শলা-পরামর্শ দিয়া চোখ মুছিয়া বিদায় লইল।

কেষ্ট আশ্রয় পাইল।

কাদম্বিনীর স্বামী নবীন মুখুয্যের ধান-চালের আড়ত ছিল। তিনি বেলা বারোটার পর বাড়ী ফিরিয়া কেষ্টকে বক্র কটাক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, এটি কে?

কাদম্বিনী মুখ ভার করিয়া জবাব দিলেন, তোমার বড়কুটুম গো, বড়কুটুম! নাও, খাওয়াও পরাও, মানুষ কর—পরকালের কাজ হোক।

নবীন সৎ শাশুড়ীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়াছিলেন, ব্যাপারটা বুঝিলেন ; কহিলেন, বটে ! বেশ নধর গোলগাল দেহটি ত !

স্ত্রী কহিলেন, বেশ হবে না কেন ? বাপ আমার বিষয়-আশয় যা কিছু রেখে গিয়েছিলেন, সে সমস্তই ত ঐ হতভাগার পেটে ঢুকেছে। আমি ত তার একটি কাণা-কড়িও পেলুম না।

বলা বাহুল্য, এই বিষয়-আশয় একখানি মাটির ঘর এবং তৎসংলগ্ন একটি বাতাবি নেবুর গাছ। ঘরটিতে বিধবা মাথা গুঁজিয়া থাকিতেন এবং নেবুগুলি বিক্রী করিয়া ছেলের স্কুলের মাহিনা যোগাইতেন। নবীন রোষ চাপিয়া বলিলেন, খুব ভাল !

কাদম্বিনী কহিলেন, ভাল নয় আবার ! বড়কুটুম যে গো ! তাঁকে তার মত রাখতে হবে ত ! এতে আমার পাঁচুগোপালের বরাতে এক বেলা এক সন্ধ্যা জোটে ত তাই ঢের ! নইলে অখ্যাতিতে দেশ ভ'রে যাবে। বলিয়া পাশের বাড়ীর দোতলা ঘরের বিশেষ একটা খোলা জানালার প্রতি রোষকষায়িত লোচনের অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এই ঘরটা তাঁর মেজজা হেমাঙ্গিনীর।

কেষ্ট বারান্দার একধারে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। কাদম্বিনী ভাঁড়ারে ঢুকিয়া একটা নারিকেল মালায় একটুখানি তেল আনিয়া, তাহার পাশে ধরিয়া দিয়া কহিলেন, আর মায়া-কান্না কাঁদতে হবে না, যাও, পুকুর থেকে ডুব দিয়ে এসোগে—বলি, ফুলেল তেল-টেল মাখার অভ্যাস নেই ত ? স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া চেঁচাইয়া বলিলেন, তুমি চান্ কর্‌তে যাবার সময় বাবুকে ডেকে নিয়ে যেয়ো গো,

নইলে ডুবে ম'লে--ট'লে বাড়ীশুদ্ধ লোকের হাতে দড়ি পড়বে।

কেষ্ট ভাত খাইতে বসিয়াছিল, সে স্বভাবতঃই ভাতটা কিছু বেশী খাইত। তাহাতে কাল বিকাল হইতে খাওয়া হয় নাই, আজ এতখানি পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে—বেলাও হইয়াছে। নানা কারণে পাতের ভাতগুলি নিঃশেষ করিয়াও তাহার ঠিক ক্ষুধা মিটে নাই। নবীন অদূরে খাইতে বসিয়াছিলেন; লক্ষ্য করিয়া স্ত্রীকে কহিলেন,কেষ্টকে আর দুটি ভাত দাও গো—

দিই, বলিয়া কাদম্বিনী উঠিয়া গিয়া পরিপূর্ণ একথালা ভাত আনিয়া সমস্তটা তাহার পাতে ঢালিয়া দিয়া, উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন, তবেই হয়েছে! এ হাতীর খোরাক নিত্য যোগাতে গেলে যে আমাদের আড়ত খালি হ'য়ে যাবে! ওবেলা দোকান থেকে মণ দুই মোটা চাল পাঠিয়ে দিয়ো, নইলে দেউলে হ'তে দেরী হবে না, তা ব'লে রাখছি।

মর্ম্মান্তিক লজ্জায় কেষ্টর মুখখানি আরও ঝুঁকিয়া পড়িল। সে এক মায়ের এক ছেলে। দুঃখিনী মায়ের কাছে সরু চাল খাইতে পাইয়াছিল কি না, সে খবর জানি না, কিন্তু পেট ভরিয়া ভাত খাওয়ার অপরাধে কোনদিন যে লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে হয় নাই, তাহা জানি। তাহার মনে পড়িল, হাজার বেশী খাইয়াও কখন মায়ের মনের সাধ মিটাইতে পারে নাই। মনে পড়িল, এই সেদিনও ঘুড়ি লাটাই কিনিবার জন্য দুমুঠা ভাত বেশী খাইয়া পয়সা আদায় করিয়া লইয়াছিল।

তাহার দুই চোখের কোণ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা

ভাতের থালার উপর নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, সে সেই ভাত মাথা গুঁজিয়া গিলিতে লাগিল। বাঁ হাতটা তুলিয়া চোখ মুছিতে পর্য্যন্ত সাহস করিল না, পাছে দিদির চোখে পড়ে। অনতিপূর্ব্বেই মায়া-কান্না কাঁদার অপরাধে বকুনি খাইয়াছিল। সেই ধমক তাহার এতবড় মাতৃশোকেরও ঘাড় চাপিয়া রাখিল।

২

পৈতৃক বাড়ীটা দুই ভায়ে ভাগ করিয়া লইয়াছিল।

পাশের দোতলা বাড়ীটা মেজভাই বিপিনের। ছোটভাইয়ের অনেক দিন মৃত্যু হইয়াছিল। বিপিনেরও ধান-চালের কারবার। তাঁহার অবস্থাও ভাল, কিন্তু বড়ভাই নবীনের সমান নয়। তথাপি ইঁহার বাড়ীটাই দোতলা। মেজবৌ হেমাঙ্গিনী সহরের মেয়ে। তিনি দাসদাসী রাখিয়া, লোকজন খাওয়াইয়া জাঁকজমকে থাকিতে ভালবাসেন। পয়সা বাঁচাইয়া গরিবী চালে চলেন না বলিয়াই বছর-চারেক পূর্ব্বে দুই জায়ে কলহ করিয়া পৃথক হইয়াছিলেন। সেই অবধি প্রকাশ্য কলহ অনেকবার হইয়াছে, অনেকবার মিটিয়াছে, কিন্তু মনোমালিন্য একটি দিনের জন্যও ঘুচে নাই। কারণ, সেটা বড়জা কাদম্বিনীর একলার হাতে। তিনি পাকা লোক, ঠিক বুঝিতেন, ভাঙা হাঁড়ি জোড়া লাগে না ; কিন্তু মেজবৌ অত পাকা নয়, অমন করিয়া বুঝিতেও পারিতেন না। ঝগড়াটা প্রথমে তিনিই করিয়া

ফেলিতেন বটে, কিন্তু তিনিই মিটাইবার জন্য, কথা কহিবার জন্য, খাওয়াইবার জন্য, ভিতরে ভিতরে ছট্‌ফট্‌ করিয়া একদিন আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া বসিতেন। শেষে, হাতে পায়ে পড়িয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া, ঘাট মানিয়া বড়জাকে নিজের ঘরে ধরিয়া আনিয়া ভাব করিতেন। এমনি করিয়া দুই জায়ের অনেক দিন কাটিয়াছে। আজ বেলা তিনটা সাড়ে তিনটার সময় হেমাঙ্গিনী এ বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কূপের পার্শ্বে সিমেণ্ট বাঁধান বেদীর উপর রোদে বসিয়া কেষ্ট সাবান দিয়া একরাশ কাপড় পরিষ্কার করিতেছিল। কাদম্বিনী দূরে দাঁড়াইয়া, অল্প সাবান ও অধিক গায়ের জোরে কাপড় কাচিবার কৌশলটা শিখাইয়া দিতেছিলেন। মেজজাকে দেখিবামাত্রই বলিয়া উঠিলেন, মাগো,—ছোঁড়াটা কি নোঙরা কাপড়-চোপড় নিয়েই এসেছে!

কথাটা সত্য। কেষ্টর সেই লাল পেড়ে ধুতিটা পরিয়া এবং চাদরটা গায়ে দিয়া কেহ কুটুমবাড়ী যায় না। দুটাকে পরিষ্কার করার আবশ্যক ছিল বটে, কিন্তু, রজকের অভাবে ঢের বেশী আবশ্যক হইয়াছিল, পুত্র পাঁচুগোপালের জোড়া-দুই এবং তাহার পিতার জোড়া-দুই পরিষ্কার করিবার। কেষ্ট আপাততঃ তাহাই করিতেছিল। হেমাঙ্গিনী চাহিয়াই টের পাইলেন বস্ত্রগুলি কাহাদের; কিন্তু সে উল্লেখ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ছেলেটি কে দিদি? ইতিপূর্ব্বে নিজের ঘরে বসিয়া আড়ি পাতিয়া তিনি সমস্তই অবগত হইয়াছিলেন। দিদি ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, দিব্যি ছেলেটি ত!

মুখের ভাব তোমার মতই দিদি। বলি, বাপের বাড়ীর কেউ না কি?

কাদম্বিনী বিরক্ত মুখে জবাব দিলেন, হুঁ, আমার বৈমাত্র ভাই। ওরে ও কেষ্ট, মেজদিদিকে একটা প্রণাম কর্ না রে! কি অসভ্য ছেলে বাবা! গুরুজনকে একটা নমস্কার কর্‌তে হয়, তাও কি তোর মা শিখিয়ে দিয়ে মরেনি রে?

কেষ্ট থতমত খাইয়া উঠিয়া আসিয়া কাদম্বিনীর পায়ের কাছেই নমস্কার করাতে তিনি ধমকাইয়া উঠিলেন, আ মর্, হাবা কালা নাকি? কাকে প্রণাম কর্‌তে বল্‌লুম, কাকে এসে কর্‌লে!

বস্তুতঃ আসিয়া অবধি তিরস্কার ও অপমানের অবিশ্রাম আঘাতে তাহার মাথা বে-ঠিক হইয়া গিয়াছিল। কথার ঝাঁজে ব্যস্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া হেমাঙ্গিনীর পায়ের কাছে সরিয়া শির অবনত করিতেই তিনি হাত দিয়া ধরিয়া ফেলিয়া, তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—থাক্ থাক্, হয়েছে ভাই—চিরজীবী হও। কেষ্ট মূঢ়ের মত তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। এ দেশে এমন করিয়া যে কেহ কথা বলিতে পারে, ইহা যেন তাহার মাথায় ঢুকিল না।

তাহার সেই কুণ্ঠিত, ভীত, অসহায় মুখখানির পানে চাহিবা-মাত্রই হেমাঙ্গিনীর বুকের ভিতরটা যেন মুচড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল। নিজেকে আর সামলাইতে না পারিয়া, সহসা এই হতভাগ্য অনাথ বালককে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া, তাহার পরিশ্রান্ত ঘর্ম্মাপ্লুত মুখখানি নিজের আঁচলে মুছাইয়া দিয়া,

জাকে কহিলেন, আহা, একে দিয়ে কি কাপড় কাচিয়ে নিতে আছে দিদি, একটা চাকর ডাকনি কেন ?

কাদম্বিনী হঠাৎ অবাক হইয়া জবাব দিতে পারিলেন না ; কিন্তু নিমিষে সামলাইয়া লইয়া রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, আমি ত তোমার মত বড়মানুষ নই মেজবৌ, যে, বাড়ীতে দশ-বিশটা দাস-দাসী আছে ? আমাদের গেরস্ত ঘরে—

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই হেমাঙ্গিনী নিজের ঘরের দিকে মুখ তুলিয়া মেয়েকে ডাকিয়া কহিলেন, উমা, শিবুকে একবার এবাড়ীতে পাঠিয়ে দে ত, বট্‌ঠাকুর আর পাঁচুর ময়লা কাপড়গুলো পুকুর থেকে কেচে এনে শুকোতে দিক্। বড় জা'য়ের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিলেন, এ বেলা কেষ্ট আর পাঁচুগোপাল, আমার ওখানে খাবে দিদি। সে ইস্কুল থেকে এলেই পাঠিয়ে দিও, আমি ততক্ষণ একে নিয়ে যাই। কেষ্টকে কহিল, ওঁর মত আমিও তোমার দিদি হই কেষ্ট—এসো আমার সঙ্গে। বলিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া নিজের বাড়ী চলিয়া গেলেন।

কাদম্বিনী বাধা দিলেন না। অধিকন্তু হেমাঙ্গিনী-প্রদত্ত এত বড় খোঁচাটাও নিঃশব্দে হজম করিলেন। তাহার কারণ, যে ব্যক্তি খোঁচা দিয়াছে, সে এ বেলার খরচটাও বাঁচাইয়া দিয়াছে। কাদম্বিনীর পয়সার বড় সংসারে আর কিছু ছিল না। তাই, গাভী দুধ দিতে দাঁড়াইয়া পা ছুড়িলে তিনি সহিতে পারিতেন।

৩

সন্ধ্যার সময় কাদম্বিনী প্রশ্ন করিলেন, কি খেয়ে এলি রে কেষ্ট ?

কেষ্ট সলজ্জ নতমুখে কহিল, লুচি।

কি দিয়ে খেলি ?

কেষ্ট তেমনিভাবে বলিল, রুইমাছের মুড়োর তরকারি, সন্দেশ রসগো—

ইস্! বলি মেজঠাক্‌রুণ মুড়োটা কার পাতে দিলেন ?

হঠাৎ এই প্রশ্নে কেষ্টর মুখখানি পাণ্ডুর হইয়া গেল। উদ্যত বুকের ভিতরটায় যেন কেমন করিতে লাগিল। দেরী দেখিয়া কাদম্বিনী কহিলেন, তোর পাতে বুঝি ?

গুরুতর অপরাধীর মত কেষ্ট মাথা হেঁট করিল।

অদূরে দাওয়ায় বসিয়া নবীন তামাক খাইতেছিলেন। কাদম্বিনী সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বলি শুনলে ত ?

নবীন সংক্ষেপে হুঁ বলিয়া হুঁকায় টান দিলেন।

কাদম্বিনী উষ্মার সহিত বলিতে লাগিলেন, খুড়ি, আপনার লোক, তার ব্যবহার দেখ! পাঁচুগোপাল আমার রুইমাছের মুড়ো বল্‌তে অজ্ঞান, সে কি তা জানে না? তবে কোন্ আক্কেলে তার পাতে না দিয়ে বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে দিলে ? বলি, হ্যাঁরে কেষ্ট, সন্দেশ রসগোল্লা খুব পেট ভরে খেলি ? সাতজন্ম তুই এসব কোনদিন চোখেও দেখিস্‌নি। স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল, যারা দুটি ভাত পেলে বেঁচে যায়, তাদের পেটে

লুচি-সন্দেশ কি হবে! কিন্তু আমি বল্‌চি তোমাকে, কেষ্টকে মেজগিন্নী বিগ্‌ড়ে না দেয় ত আমাকে কুকুর ব'লে ডেকো।

নবীন মৌন হইয়া রহিলেন। কারণ স্ত্রী বিদ্যমানে মেজবৌ তাহাকে বিগড়াইয়া ফেলিতে পারিবে, এরূপ দুর্ঘটনা তিনি বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহার স্ত্রীর কিন্তু স্বামীর উপরে বিশ্বাস ছিল না, বরং ষোলআনা ভয় ছিল, সাদাসিধা ভালোমানুষ বলিয়া যে-কেহ তাঁহাকে ঠকাইয়া লইতে পারে। সেইজন্য ছোটভাই কেষ্টর মানসিক উন্নতি অবনতির প্রতি সেই অবধি তিনি প্রখর দৃষ্টি পাতিয়া রাখিলেন।

পরদিন হইতেই দুটো চাকরের একটাকে ছাড়ান হইল, কেষ্ট নবীনের ধান-চালের আড়তে কাজ করিতে লাগিল। সেখানে সে ওজন করে, বিক্রী করে, চার-পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া নমুনা সংগ্রহ করিয়া আনে, দুপুর-বেলা নবীন ভাত খাইতে আসিলে দোকান আগলায়। দিন-দুই পরে একদিন তিনি আহার-নিদ্রা সমাপ্ত করিয়া ফিরিয়া গেলে, সে ভাত খাইতে আসিয়াছিল। তখন বেলা তিনটা। কেষ্ট পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিয়া দেখিল, দিদি ঘুমাইতেছেন। তাহার তখনকার ক্ষুধার তাড়নায় বোধ করি বাঘের মুখ হইতেও খাবার কাড়িয়া আনিতে পারিত, কিন্তু দিদিকে ডাকিয়া তুলিবে এ সাহস হইল না।

রান্নাঘরের দাওয়ার একধারে চুপটি করিয়া সে দিদির ঘুমভাঙ্গার আশায় বসিয়াছিল, হঠাৎ ডাক শুনিল—কেষ্ট?

সে আহ্বান কি স্নিগ্ধ হইয়াই তাহার কানে বাজিল! মুখ তুলিয়া দেখিল মেজদি তাঁহার দোতলার ঘরের জানালা ধরিয়া

দাঁড়াইয়া আছেন। কেষ্ট একটিবার চাহিয়াই মুখ নামাইল। খানিক পরে হেমাঙ্গিনী নামিয়া আসিয়া, সুমুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কদিন দেখিনি ত? এখানে চুপ ক'রে ব'সে কেন কেষ্ট? একে ত ক্ষুধায় অল্পেই চোখে জল আসে, তাহাতে এমন স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বর! তাহার দুচোখ টল্ টল্ করিতে লাগিল। সে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল, উত্তর দিতে পারিল না।

মেজখুড়িমাকে সব ছেলেমেয়ে ভালবাসিত। তাঁহার গলার স্বর শুনিয়া কাদম্বিনীর ছোটমেয়ে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়াই চেঁচাইয়া বলিল, কেষ্টমামা, রান্নাঘরে তোমার ভাত ঢাকা আছে, খাওগে, মা খেয়ে-দেয়ে ঘুমোচ্চে।

হেমাঙ্গিনী অবাক হইয়া কহিলেন, কেষ্টর এখনও খাওয়া হয়নি, তোর মা খেয়ে ঘুমোচ্চে কি রে—হাঁ কেষ্ট, আজ এত বেলা হ'ল কেন?

কেষ্ট ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। টুনি তাহার হইয়া জবাব দিল, কেষ্টমামার রোজ ত এম্‌নি বেলাই হয়। বাবা খেয়ে-দেয়ে দোকানে ফিরে গেলে তবে ত ও খেতে আসে।

হেমাঙ্গিনী বুঝিলেন, কেষ্টকে দোকানের কাজে লাগান হইয়াছে। তাহাকে বসাইয়া খাওয়ান হইবে, এ আশা অবশ্য তিনি করেন নাই, কিন্তু একবার এই বেলার দিকে চাহিয়া, একবার এই ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় আর্ত্ত শিশুদেহের পানে চাহিয়া তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেন। মিনিট দুই পরে একবাটি

দুধহাতে ফিরিয়া আসিয়া, রান্নাঘরে ঢুকিয়াই শিহরিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন।

কেষ্ট খাইতে বসিয়াছিল। একটা পিতলের থালার উপর ঠাণ্ডা শুকনো ড্যালা পাকান ভাত। একপাশে একটুখানি ডাল, ও কি একটু তরকারির মত। দুধটুকু পাইয়া তাহার মলিন মুখখানি হাসিতে ভরিয়া গেল।

হেমাঙ্গিনী দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কেষ্ট খাওয়া শেষ করিয়া পুকুরে আঁচাইতে চলিয়া গেলে একবারটি মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, পাতে গোণা একটিও ভাত পড়িয়া নাই। ক্ষুধার জ্বালায় সে সেই অন্ন নিঃশেষ করিয়া খাইয়াছে।

হেমাঙ্গিনীর ছেলে ললিতও প্রায় সেই বয়সী। নিজের অবর্ত্তমানে নিজের ছেলেকে এই অবস্থায় হঠাৎ কল্পনা করিয়া ফেলিয়া কান্নার ঢেউ তাঁহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ফেনাইয়া উঠিল। তিনি সেই কান্না চাপিতে চাপিতে বাড়ী চলিয়া গেলেন।

৪

সর্দ্দি উপলক্ষ করিয়া হেমাঙ্গিনীর মাঝে মাঝে জ্বর হইত, দিন-দুই থাকিয়া আপনি ভাল হইয়া যাইত। দিন কয়েক পরে এমনি একটু জ্বর বোধ হওয়ায় সন্ধ্যার পর বিছানায় পড়িয়াছিলেন। ঘরে কেহ ছিল না, হঠাৎ মনে হইল কে যেন অতি সন্তর্পণে কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। ডাকিলেন, কে রে ওখানে দাঁড়িয়ে, ললিত ?

কেহ সাড়া দিল না। আবার ডাকিতে, আড়াল হইতে জবাব আসিল, আমি।

কে আমি রে ? আয়, ঘরে এসে ব'স।

কেষ্ট সসঙ্কোচে ঘরে ঢুকিয়া দেয়াল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। হেমাঙ্গিনী উঠিয়া বসিয়া সস্নেহে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন রে কেষ্ট ?

কেষ্ট আরও একটু সরিয়া আসিয়া, মলিন কোঁচার খুঁট খুলিয়া দুটি আধ পাকা পেয়ারা বাহির করিয়া বলিল, জ্বরের উপর খেতে বেশ।

হেমাঙ্গিনী সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া বলিলেন, কোথায় পেলি রে ? আমি কাল থেকে লোকের কত খোসামোদ কচ্চি, কেউ এনে দিতে পারেনি।—বলিয়া পেয়ারাশুদ্ধ কেষ্টর হাতখানি ধরিয়া কাছে বসাইলেন। কেষ্ট লজ্জায় আহ্লাদে আরক্ত মুখ হেঁট করিল। যদিও, এটা পেয়ারার সময় নয়, হেমাঙ্গিনীও

খাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন নাই, তথাপি এই দুইটি সংগ্রহ করিয়া আনিতে দুপুর-বেলার সমস্ত রোদটা কেষ্টর মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল। হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ কেষ্ট, কে তোকে বললে, আমার জ্বর হয়েছে ?

কেষ্ট জবাব দিল না।

কে বললে রে আমি পেয়ারা খেতে চেয়েচি ?

কেষ্ট তাহারও জবাব দিল না। সে সেই যে মুখ হেঁট করিল, আর তুলিতেই পারিল না। ছেলেটি যে অতিশয় লাজুক ও ভীরুস্বভাব, হেমাঙ্গিনী তাহা পূর্ব্বেই টের পাইয়াছিলেন। তখন তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিয়া, আদর করিয়া, দাদা বলিয়া ডাকিয়া, আরও কত কি কৌশলে তাহার ভয় ভাঙ্গাইয়া, অনেক কথা জানিয়া লইলেন। বিস্তর অনুসন্ধানে পেয়ারা সংগ্রহ করিবার কথা হইতে সুরু করিয়া, তাহাদের দেশের কথা, মায়ের কথা, এখানে খাওয়া-দাওয়ার কথা, দোকানে কি কি কাজ করিতে হয়, তাহার কথা—একে একে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া লইয়া চোখ মুছিয়া বলিলেন, এই তোর মেজদিকে কখনও কিছু লুকোস্‌নে কেষ্ট, যখন যা দরকার হবে, চুপি চুপি এসে চেয়ে নিস্—নিবি ত ?

কেষ্ট আহ্লাদে মাথা নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা।

সত্যকার স্নেহ যে কি, তাহা দুঃখী মায়ের কাছে কেষ্ট শিখিয়াছিল। এই মেজদির মধ্যে তাহাই আস্বাদ করিয়া কেষ্টর রুদ্ধ মাতৃশোক আজ গলিয়া ঝরিয়া গেল। উঠিবার সময় সে

মেজদির পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া যেন বাতাসে ভাসিতে ভাসিতে বাহির হইয়া আসিল।

কিন্তু, তাহার দিদির আক্রোশ তাহার প্রতি প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। কারণ, সে সৎমার ছেলে, সে নিরুপায়—অখ্যাতির ভয়ে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়াও যায় না, বিলাইয়া দেওয়াও যায় না। সুতরাং, যখন রাখিতেই হইবে, তখন যতদিন তাহার দেহ বহে, ততদিন কষিয়া খাটাইয়া লওয়াই ঠিক।

সে ঘরে ফিরিয়া আসিতেই দিদি ধরিয়া পড়িলেন—সমস্ত দুপুর দোকান পালিয়ে কোথা ছিলি রে কেষ্ট?

কেষ্ট চুপ করিয়া রহিল। কাদম্বিনী ভয়ানক রাগিয়া বলিলেন, বল্ শীগ্‌গির।

কেষ্ট তথাপি নিরুত্তর হইয়া রহিল। মৌন থাকিলে যাহাদের রাগ পড়ে, কাদম্বিনী সে দলের নহেন। অতএব কথা বলাইবার জন্য তিনি যতই জেদ করিতে লাগিলেন, বলাইতে না পারিয়া তাঁহার ক্রোধ এবং রোখ ততই চড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে পাঁচুগোপালকে ডাকিয়া তাহার দুই কান পুনঃ পুনঃ মলাইয়া দিলেন এবং তাহার জন্য রাত্রে হাঁড়িতে চাল লইলেন না।

আঘাত যতই গুরুতর হোক, প্রতিহত হইতে না পাইলে লাগে না। পর্ব্বত-শিখর হইতে নিক্ষেপ করিলেই হাত-পা ভাঙে না, ভাঙে শুধু তখনই—যখন পদতলস্পৃষ্ট কঠিন ভূমি সেই বেগ প্রতিরোধ করে। ঠিক তাহাই হইয়াছিল কেষ্টর।

মায়ের মরণ যখন পায়ের নীচের নির্ভরস্থলটুকু তাহার একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিল, তখন হইতে বাহিরের কোন আঘাতই তাহাকে আঘাত করিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারিল না। সে দুঃখীর ছেলে, কিন্তু কখনও দুঃখ পায় নাই। লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সহিত তাহার পূর্ব্বপরিচয় ছিল না, তথাপি এখানে আসা অবধি কাদম্বিনীর দেওয়া কঠোর দুঃখকষ্ট সে যে অনায়াসে সহ্য করিতে পারিতেছিল, সে শুধু পায়ের তলায় অবলম্বন ছিল না বলিয়াই; কিন্তু আজ আর পারিল না। আজ সে হেমাঙ্গিনীর মাতৃ-স্নেহের নির্ভর ভিত্তির সন্ধান পাইয়াছিল, তাই, আজিকার এই অত্যাচার অপমান তাহাকে একেবারে ব্যাকুল করিয়া দিল। মাতাপুত্র এই নিরপরাধ নিরাশ্রয় শিশুকে শাসন করিয়া, লাঞ্ছনা করিয়া, অপমান করিয়া, দণ্ড দিয়া চলিয়া গেলেন, সে অন্ধকার ভূশয্যায় পড়িয়া আজ অনেক দিনের পর আবার মাকে স্মরণ করিয়া মেজদির নাম করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

৫

পরদিন সকালে কেষ্ট হঠাৎ গুটি গুটি ঘরে ঢুকিয়া হেমাঙ্গিনীর পায়ের কাছে বিছানার একপাশে আসিয়া বসিল। হেমাঙ্গিনী পা দুইটি একটু গুটাইয়া লইয়া সস্নেহে বলিলেন, দোকানে যাস্‌নি কেষ্ট?

এইবার যাব।

দেরী করিস্ নে দাদা, এই বেলা যা। নইলে এক্ষুণি আবার গালাগালি করবে।

কেষ্টর মুখ একবার আরক্ত, একবার পাণ্ডুর হইল। যাই, বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার ইতস্ততঃ করিয়া কি একটা বলিতে গিয়া আবার চুপ করিল।

হেমাঙ্গিনী তাহার মনের কথা যেন বুঝিলেন, বলিলেন, কিছু বলবি আমাকে রে?

কেষ্ট মাটির দিকে চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, কাল কিছু খাইনি মেজদি—

কাল থেকে খাসনি! বলিস্ কি কেষ্ট? কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত হেমাঙ্গিনী স্থির হইয়া রহিলেন, তাহার পর দুই চোখ জলে পূর্ণ হইয়া গেল। সেই জল ঝর ঝর করিয়া ঝরিতে লাগিল। তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আর একবার কাছে বসাইয়া, একটি একটি করিয়া সব কথা শুনিয়া লইয়া বলিলেন, কাল, রাত্তিরে কেন এলিনে?

কেষ্ট চুপ করিয়া রহিল। হেমাঙ্গিনী আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, আমার মাথার দিব্যি রইল, ভাই, আজ থেকে আমাকে তোর সেই মরা মা ব'লে মনে করবি।

যথাসময়ে সমস্ত কথা কাদম্বিনীর কানে গেল। তিনি নিজের বাড়ী হইতে মেজবৌকে ডাক দিয়া বলিলেন, ভাইকে আমি কি খাওয়াতে পারি না যে, তুমি অত কথা তাকে গায়ে পড়ে ব'ল্‌তে গেছ?

কথার ধরণ দেখিয়া হেমাঙ্গিনীর গা-জ্বালা করিয়া উঠিল;

কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, যদি গায়ে প'ড়েই ব'লে থাকি, তাতেই বা দোষ কি ?

কাদম্বিনী প্রশ্ন করিলেন, তোমার ছেলেটিকে ডেকে এনে আমি যদি এম্‌নি ক'রে বলি, তোমার মানটি থাকে কোথায় শুনি ? তুমি এমন ক'রে 'নাই' দিলে আমি তাকে শাসন করি কি ক'রে বল দেখি ?

হেমাঙ্গিনী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, দিদি, পনের-ষোল বছর এক সঙ্গে ঘর করচি—তোমাকে আমি চিনি। পেটে মেরে আগে তোমার নিজের ছেলেকে শাসন কর তার পরে পরের ছেলেকে ক'রো, তখন গায়ে প'ড়ে কথা কইতে যাবো না।

কাদম্বিনী অবাক্ হইয়া বলিলেন, আমার পাঁচুগোপালের সঙ্গে ওর তুলনা ? দেবতার সঙ্গে বাঁদরের তুলনা ? এর পরে আরও কি যে তুমি ব'লে বেড়াবে, তাই ভাবি মেজবৌ।

মেজবৌ উত্তর দিলেন, কে দেবতা, কে বাঁদর, সে আমি জানি ; কিন্তু আর আমি কিছুই বলব না দিদি, যদি বলি ত এই যে—তোমার মত নিষ্ঠুর, তোমার মত বেহায়া মেয়েমানুষ আর সংসারে নেই। বলিয়া তিনি প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে অর্থাৎ কর্ত্তারা ঘরে ফিরিবার সময়টিতে বড়বৌ নিজের বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া দাসীকে উপলক্ষ করিয়া উচ্চকণ্ঠে তর্জ্জন-গর্জ্জন আরম্ভ করিয়া দিলেন—যিনি

দিন-রাত কচ্চেন,তিনিই এর বিহিত করবেন। মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশী। আমার ভাইয়ের মর্ম্ম আমি বুঝিনে, বোঝে পরে। কখ্‌খনো ভাল হবে না—ভাই-বোনে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখলে ধর্ম্ম সইবেন না—তা ব'লে দিচ্চি, বলিয়া তিনি রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

উভয় জায়ের মধ্যে এই ধরণের গালি-গালাজ, শাপ-শাপান্ত অনেকবার অনেক রকম করিয়া হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ ঝাঁজটা কিছু বেশী। অনেক সময় হেমাঙ্গিনী শুনিয়াও শুনিতেন না, বুঝিয়াও গায়ে মাখিতেন না, কিন্তু আজ নাকি তাঁহার দেহটা খারাপ ছিল, তাই উঠিয়া আসিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া কহিলেন, এর মধ্যেই চুপ করলে কেন দিদি? ভগবান হয় ত শুনতে পান নি—আর খানিকক্ষণ ধ'রে আমার সর্ব্বনাশ কামনা কর—বটঠাকুর ঘরে আসুন, তিনি শুনুন, ইনি ঘরে এসে শুনুন—এর মধ্যেই হাঁপিয়ে পড়লে চলবে কেন?

কাদম্বিনী উঠানের উপর ছুটিয়া আসিয়া মুখ উঁচু করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, আমি কি কোন সর্ব্বনাশীর নাম মুখে এনেচি।

হেমাঙ্গিনী স্থিরভাবে জবাব দিলেন, মুখে আন্‌বে কেন দিদি, মুখে আনবার পাত্রী তুমি নও; কিন্তু তুমি কি ঠাওরাও, একা তুমিই সেয়ানা, আর পৃথিবী-শুদ্ধ ন্যাকা। ঠেস্ দিয়ে দিয়ে কার কপাল ভাঙচ, সে কি কেউ টের পায় না?

কাদম্বিনী এবার নিজমূর্ত্তি ধরিলেন। মুখ ভ্যাংচাইয়া হাত পা নাড়িয়া বলিলেন, টের পেলেই বা। যে দোষে থাক্‌বে,

তারই গায়ে লাগবে। আর একা তুমিই টের পাও, আমি পাইনে? কেষ্ট যখন এলো, সাত চড়ে রা করত না, যা বল্‌তুম, মুখ বুজে তাই করত—আজ দুপুর-বেলা কার জোরে কি জবাব দিয়ে গেল, জিজ্ঞেস ক'রে দ্যাখো এই প্রসন্নর মাকে,—বলিয়া দাসীকে দেখাইয়া দিলেন।

প্রসন্নর মা কহিল, সে কথা সত্যি মেজবৌমা। আজ সে ভাত ফেলে উঠে যেতে, মা বললেন, এই পিণ্ডিই না গিল্‌লে যখন যমের বাড়ী যেতে হবে, তখন এত তেজ কিসের জন্যে? সে ব'লে গেল, আমার মেজদি থাকতে কাউকে ভয় করিনে।

কাদম্বিনী সদর্পে বলিলেন, কেমন হ'ল ত? কার জোরে এত তেজ শুনি? আজ আমি স্পষ্ট বলে দিচ্চি, মেজবৌ, ওকে তুমি একশ বার ডেকো না। আমাদের ভাই-বোনের কথার মধ্যে থেকো না।

হেমাঙ্গিনী আর কথা কহিলেন না। কেঁচো সাপের মত চক্র ধরিয়া কামড়াইয়াছে শুনিয়া, তাঁহার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না। জানালা হইতে ফিরিয়া আসিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কত বেশী পীড়নের দ্বারা ইহাও সম্ভব হইতে পারিয়াছে।

আবার মাথা ধরিয়া জ্বর বোধ হইতেছিল, তাই অসময়ে শয্যায় আসিয়া নির্জীবের মত পড়িয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী ঘরে ঢুকিয়া ইহা লক্ষ্য না করিয়াই ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলেন, বৌঠানের ভাইকে নিয়ে আজ কি কাণ্ড বাধিয়ে ব'সে আছ? কারু মানা শুনবে না, যেখানে যত হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া আছে,

দেখ লেই তার দিকে কোমর বেঁধে দাঁড়াবে, রোজ রোজ আমার এত হাঙ্গামা সহ্য হয় না মেজবৌ! আজ বৌঠান আমাকে না হ'ক দশটা কথা শুনিয়ে দিলেন।

হেমাঙ্গিনী শান্তকণ্ঠে বলিলেন, বৌঠান হ'ক কথা কবে বলেন যে, আজ তোমাকে না-হক কথা বলেছেন?

বিপিন বলিলেন, কিন্তু আজ তিনি ঠিক কথাই বলেচেন। তোমার স্বভাব জানি ত। সেবারও বাড়ীর রাখাল ছোঁড়াটাকে নিয়ে এই রকম করলে, মতি কামারের ভায়ের অমন বাগানখানা তোমার জন্যেই মুঠোর ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল, উল্টে পুলিশ থামাতে একশ দেড়শ ঘর থেকে গেল। তুমি নিজের ভাল-মন্দও কি বোঝ না? কবে এ স্বভাব যাবে?

হেমাঙ্গিনী এবার উঠিয়া বসিয়া, স্বামীর মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, আমার স্বভাব যাবে মরণ হ'লে, তার আগে নয়। আমি মা,—আমার কোলে ছেলেপুলে আছে, মাথার উপর ভগবান আছেন। এর বেশী আমি গুরুজনের নামে নালিশ করতে চাইনে। আমার অসুখ করেচে—আর আমাকে বকিও না—তুমি যাও। বলিয়া গায়ের র‍্যাপারখানা টানিয়া লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িলেন।

বিপিন প্রকাশ্যে আর তর্ক করিতে সাহস করিলেন না; কিন্তু, মনে মনে স্ত্রীর উপর এবং বিশেষ করিয়া ঐ গলগ্রহ দুর্ভাগাটার উপর আজ মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেলেন।

৬

পরদিন সকালে জানালা খুলিতেই হেমাঙ্গিনীর কানে বড়-জায়ের তীক্ষ্ণকণ্ঠের ঝঙ্কার প্রবেশ করিল। তিনি স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, ছোঁড়াটা কাল থেকে পালিয়ে রইল, একবার খোঁজ নিলে না?

স্বামী জবাব দিলেন, চুলোয় যাক্। কি হবে খোঁজ ক'রে?

স্ত্রী কণ্ঠস্বর সমস্ত পাড়ার শ্রুতিগোচর করিয়া বলিলেন, তা হ'লে যে নিন্দের চোটে গ্রামে বাস করা দায় হবে! আমাদের শত্রু ত দেশে কম নেই, কোথাও পড়ে মরে-টরে থাকলে ছেলেবুড়ো বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে জেলখানায় যেতে হবে, তা ব'লে দিচ্চি।

হেমাঙ্গিনী সমস্তই বুঝিলেন এবং তৎক্ষণাৎ জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

দুপুর-বেলা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া খান-কতক রুটি খাইতেছিলেন, হঠাৎ চোরের মত সন্তর্পণে পা ফেলিয়া কেষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইল। চুল রুক্ষ, মুখ শুষ্ক।

কোথায় পালিয়েছিলি রে কেষ্ট?

পালাইনি ত। কাল সন্ধ্যার পর দোকানে শুয়েছিলুম, ঘুম ভেঙে দেখি, দুপুর রাত্তির। ক্ষিদে পেয়েচে মেজদি।

ও বাড়ীতে গিয়ে খেগে যা। বলিয়া হেমাঙ্গিনী নিজের রুটির থালায় মনোযোগ করিলেন।

মিনিট-খানেক চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কেষ্ট চলিয়া

যাইতেছিল, হেমাঙ্গিনী ডাকিয়া ফিরাইয়া কাছে বসাইলেন, এবং সেইখানেই ঠাঁই করিয়া রাঁধুনীকে ভাত দিতে বলিলেন।

তাহার খাওয়া প্রায় অর্দ্ধেক অগ্রসর হইয়াছিল, এমন সময় উমা বহির্বাটী হইতে ত্রস্তব্যস্ত-ভাবে ছুটিয়া আসিয়া নিঃশব্দ ইঙ্গিতে জানাইল—বাবা আস্‌চেন যে!

মেয়ের ভাব দেখিয়া মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, তাতে তুই অমন কচ্ছিস্‌ কেন?

উমা কেষ্টর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল. প্রত্যুত্তরে তাহাকেই আঙুল দিয়া দেখাইয়া, চোখ-মুখ নাড়িয়া তেমনি ইসারায় প্রকাশ করিল—খাচ্চে যে!

কেষ্ট কৌতূহলী হইয়া ঘাড় ফিরাইয়াছিল।

উমার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি, শঙ্কিত মুখের ইসারা তাহার চোখে পড়িল। এক মুহূর্ত্তে তাহার মুখ সাদা হইয়া গেল। কি ত্রাস যে তাহার মনে জন্মিল—সেই জানে। মেজদি, বাবু আস্‌চেন, বলিয়াই সে ভাত ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া রান্নাঘরের দোরের আড়ালে দাঁড়াইল। তাহার দেখাদেখি উমাও আর একদিকে পলাইয়া গেল। অকস্মাৎ গৃহস্বামীর আগমনে চোরের দল যেরূপ ব্যবহার করে, ইহারাও ঠিক সেইরূপ আচরণ করিয়া বসিল। প্রথমটা হেমাঙ্গিনী হতবুদ্ধির মত একবার এদিকে একবার ওদিকে চাহিলেন, তারপরে পরিশ্রান্তের মত দেয়ালে ঠেস্‌ দিয়া এলাইয়া পড়িলেন। লজ্জা ও অপমানের শূল যেন তাঁহার বুকখানা এফোঁড় ওফোঁড় করিয়া দিয়া গেল। পরক্ষণেই বিপিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মুখেই স্ত্রীকে

ওভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, কাছে আসিয়া উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করিলেন, ও কি, খাবার নিয়ে অমন করে বসে যে ?

হেমাঙ্গিনী জবাব দিলেন না। বিপিন অধিকতর উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, আবার জ্বর হ'ল না কি ? অভুক্ত ভাতের থালাটার পানে চোখ পড়ায় বলিলেন, এখানে এত ভাত ফেলে উঠে গেল কে ? ললিত বুঝি ?

হেমাঙ্গিনী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, না, সে নয়—ও বাড়ীর কেষ্ট খাচ্ছিল, তোমার ভয়ে দোরের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছে।

কেন ?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, কেন, তা তুমিই ভাল জান। আর শুধু সে নয়, তুমি আস্চ খবর দিয়েই উমাও ছুটে পালিয়েচে।

বিপিন মনে মনে বুঝিলেন, স্ত্রীর কথাবার্ত্তা বাঁকা পথ ধরিয়াছে। তাই বোধ করি, সোজা পথে ফিরাইবার অভিপ্রায়ে সহাস্যে বলিলেন, ও বেটী পালাতে গেল কি দুঃখে ?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, কি জানি! বোধ করি, মায়ের অপমান চোখে দেখবার ভয়েই পালিয়েচে। পরক্ষণে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কেষ্ট পরের ছেলে, সে ত লুকোবেই। পেটের মেয়েটা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে পারলে না যে, তার মায়ের কাউকে ডেকে একমুঠো ভাত দেবার অধিকারটুকুও আছে !

এবার বিপিন টের পাইলেন, ব্যাপারটা সত্যিই বিশ্রী হইয়া উঠিয়াছে। অতএব পাছে একেবারে বাড়াবাড়িতে গিয়া পৌঁছায়, এজন্য অভিযোগটাকে সামান্য পরিহাসে পরিণত করিয়া

চোখ টিপিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না—তোমার কোন অধিকার নেই! ভিখিরি এলে ভিক্ষেও না। সে যাক্—কাল থেকে আর মাথা ধরেনি ত? আমি মনে কর্‌চি, সহর থেকে কেদার ডাক্তারকে ডেকে পাঠাই—না হয়, একবার কলকাতায়—

অসুখ ও চিকিৎসার পরামর্শটা এখানেই থামিয়া গেল। হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, উমার সামনে তুমি কেষ্টকে কিছু বলেছিলে?

বিপিন যেন আকাশ হইতে পড়িলেন—আমি? কৈ না। ও হাঁ—সেদিন যেন মনে হচ্ছে বলেছিলুম—বৌঠান্ রাগ করেন—দাদা বিরক্ত হন—উমা বোধ করি সেখানে দাঁড়িয়েছিল—কি জান—

জানি, বলিয়া হেমাঙ্গিনী কথাটা চাপা দিয়া দিলেন। বিপিন ঘরে ঢুকিতেই তিনি কেষ্টকে বাহিরে ডাকিয়া বলিলেন, কেষ্ট, এই চারটে পয়সা নিয়ে দোকান থেকে কিছু মুড়িটুড়ি কিনে খেগে যা। ক্ষিদে পেলে আর আসিস্‌নে আমার কাছে। তোর মেজদির এমন জোর নেই যে, সে বাইরের মানুষকে একমুঠো ভাত খেতে দেয়।

কেষ্ট নিঃশব্দে চলিয়া গেল। ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া বিপিন তাহার পানে চাহিয়া ক্রোধে দাঁত কড়মড় করিলেন।

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন বৈকালে বিপিন অত্যন্ত বিরক্ত মুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, এ সব কি তুমি সুরু করলে মেজবৌ? কেষ্ট তোমার কে যে, একটা পরের ছেলে নিয়ে দিন-রাত আপনা-আপনির মধ্যে লড়াই করে বেড়াচ্চ? আজ দেখলুম, দাদা পর্য্যন্ত ভারি রাগ করেচেন।

অনতিপূর্ব্বে নিজের ঘরে বসিয়া বড়বৌ স্বামীকে উপলক্ষ ও মেজবৌকে লক্ষ্য করিয়া চীৎকার শব্দে যে সকল অপভাষার তীর ছুড়িয়া ছিলেন, তাহার একটিও নিষ্ফল হয় নাই। সব কটি আসিয়াই হেমাঙ্গিনীকে বিঁধিয়াছিল এবং প্রত্যেকটি মুখে করিয়া যে পরিমাণ বিষ বহিয়া আনিয়াছিল, তাহার জ্বালাটাও কম জ্বলিতেছিল না; কিন্তু মাঝখানে ভাশুর বিদ্যমান থাকায় হেমাঙ্গিনী সহ্য করা ব্যতীত প্রতিকারের পথ পাইতেছিলেন না।

আগেকার দিনে যেমন যবনেরা গরু সুমুখে রাখিয়া রাজপুত সেনার উপর বাণ বর্ষণ করিত, যুদ্ধ জয় করিত—বড়বৌ মেজবৌকে আজকাল প্রায়ইতেমনি করিয়া জব্দ করিতেছিলেন।

স্বামীর কথায় হেমাঙ্গিনী দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন, বল কি, তিনি পর্য্যন্ত রাগ করেচেন? এ ত বড় আশ্চর্য্য কথা, শুনলে হঠাৎ বিশ্বাস হয় না যে! এখন কি করলে রাগ থাম্‌বে বল?

বিপিন মনে মনে রাগ করিলেন, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ

করা তাঁহার স্বভাব নয়, তাই মনের ভাব গোপন করিয়া সহজভাবে বলিলেন, হাজার হ'লেও গুরুজনের সম্বন্ধে কি—

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই হেমাঙ্গিনী কহিলেন, সব জানি, ছেলে মানুষটি নই যে গুরুজনের মান-মর্য্যাদা বুঝিনে! কিন্তু ছোঁড়াটাকে ভালবাসি বলেই যেন ওঁরা আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওকে দিবারাত্র বিঁধতে থাকেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর কিছু নরম শুনাইল। কারণ, হঠাৎ ভাশুরের সম্বন্ধে শ্লেষ করিয়া ফেলিয়া তিনি নিজেই মনে মনে অপ্রতিভ হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারও গায়ের জ্বালাটা নাকি বড় জ্বলিতেছিল, তাই রাগ সামলাইতে পারেন নাই।

বিপিন গোপনে ওপক্ষে ছিলেন। কারণ, এই একটা পরের ছেলে লইয়া নিরর্থক দাদাদের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি তিনি মনে মনে পছন্দ করিতেন না। স্ত্রীর এই লজ্জাটুকু লক্ষ্য করিয়া যো পাইয়া জোর দিয়া বলিলেন, বেঁধা-বিঁধি কিছুই নয়। তাঁরা নিজেদের ছেলে শাসন করচেন, কাজ শেখাচ্চেন, তাতে তোমাকে বিঁধলে চলবে কেন? তা ছাড়া যা-ই করুন, তাঁরা গুরুজন যে!

হেমাঙ্গিনী স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া প্রথমটা কিছু বিস্মিত হইলেন। কারণ, এই পনর-ষোল বছরের ঘর-কন্নায় স্বামীর এতবড় ভ্রাতৃভক্তি তিনি ইতিপূর্ব্বে দেখেন নাই; কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। কহিলেন, তাঁরা গুরুজন, আমিও মা। গুরুজন নিজের মান নিজে নিঃশেষ ক'রে আনলে আমি কি দিয়ে ভর্ত্তি করব!

বিপিন কি একটা জবাব বোধ করি দিতে যাইতেছিলেন, থামিয়া গেলেন। দ্বারের বাহিরে কুণ্ঠিতকণ্ঠে বিনম্র ডাক শোনা গেল—

মেজদি!

স্বামী-স্ত্রীতে চোখাচোখি হইল। স্বামী একটু হাসিলেন, তাহাতে প্রীতি বিকীর্ণ হইল না। স্ত্রী অধরে ওষ্ঠ চাপিয়া কপাটের কাছে সরিয়া আসিয়া নিঃশব্দে কেষ্টর মুখের পানে চাহিতেই সে আহ্লাদে গলিয়া গিয়া প্রথমেই যা মুখে আসিল, কহিল, কেমন আছ মেজদি?

হেমাঙ্গিনী একমুহূর্ত্ত কথা কহিতে পারিলেন না। যাহার জন্য স্বামী-স্ত্রীতে এইমাত্র বিবাদ হইয়া গেল, অকস্মাৎ তাহাকে সম্মুখে পাইয়া বিবাদের সমস্ত বিরক্তিটা তাহারই মাথায় গিয়া পড়িল। হেমাঙ্গিনী অনুচ্চ কঠোর স্বরে কহিলেন, এখানে কি? কেন তুই রোজ রোজ আসিস্ বল্ ত?

কেষ্টর বুকের ভিতরটা ধক্ করিয়া উঠিল। এই কঠোর কণ্ঠস্বরটা সত্যই এত কঠোর শুনাইল যে, হেতু ইহার যা-ই হোক, বস্তুটা যে সস্নেহ পরিহাস নয়, ইহা বুঝিয়া লইতে এই দুর্ভাগা বালকটারও বিলম্ব হইল না।

ভয়ে, বিস্ময়ে, লজ্জায় মুখখানা তাহার কালি-মাখা হইয়া গেল। কহিল, দেখতে এসেচি।

বিপিন হাসিয়া বলিলেন, দেখতে এসেচে তোমাকে। এ হাসি যেন দাঁত ভ্যাংচাইয়া হেমাঙ্গিনীকে অপমান করিল। তিনি দলিতা ভুজঙ্গিনীর মত স্বামীর মুখের পানে একটিবার চাহিয়াই

চোখ ফিরাইয়া লইয়া কহিলেন, আর এখানে তুই আসিস্‌নে। যা—

আচ্ছা, বলিয়া কেষ্ট তাহার মুখের কালি হাসি দিয়া ঢাকিতে গিয়া সমস্ত মুখ আরো কালো, আরো বিশ্রী বিকৃত করিয়া অধোমুখে চলিয়া গেল।

সেই বিকৃতির কালো ছায়া হেমাঙ্গিনী নিজের মুখের উপর লইয়া স্বামীর পানে আর একবার চাহিয়া দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।

৮

দিন পাঁচ-ছয় হইয়া গেল, হেমাঙ্গিনীর জ্বর ছাড়ে নাই। কাল ডাক্তার বলিয়া গিয়াছিলেন, সর্দ্দি বুকে বসিয়াছে। সন্ধ্যার দীপ সবে মাত্র জ্বালা হইয়াছিল, ললিত ভাল কাপড় জামা পরিয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল, মা, দত্তদের বাড়ী পুতুল-নাচ হবে, দেখ্‌তে যাব?

মা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, হাঁরে ললিত, তোর মা যে এই পাঁচ-ছয় দিন পড়ে আছে, একবারটি কাছে এসেও ত বসিস্‌নে!

ললিত লজ্জা পাইয়া শিয়রের কাছে আসিয়া বসিল। মা সস্নেহে ছেলের পিঠে হাত দিয়া বলিলেন, এই অসুখ যদি না সারে, যদি ম'রে যাই, কি করিস্‌ তুই? খুব কাঁদিস্‌?

যাঃ—সেরে যাবে, বলিয়া ললিত মায়ের বুকের উপর একটা

হাত রাখিল। মা ছেলের হাতখানি হাতে লইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। জ্বরের উপর এই স্পর্শ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়া দিতে লাগিল। ইচ্ছা করিতে লাগিল, এমন করিয়া বহুক্ষণ কাটান; কিন্তু একটু পরেই ললিত উসখুস করিতে লাগিল, পুতুল নাচ হয়ত এতক্ষণে সুরু হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া, ভিতরে ভিতরে তাহার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। ছেলের মনের কথা বুঝিতে পারিয়া মা মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা যা, দেখে আয়, বেশী রাত করিস্‌নে যেন।

না মা, এক্ষণি ফিরে আসব, বলিয়া ললিত ঘরের বাহির হইয়া গেল; কিন্তু, মিনিট দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, মা, একটা কথা বলব?

মা হাসিমুখে বলিলেন, একটা টাকা চাই ত? ঐ কুলুঙ্গিতে আছে নিগে—দেখিস্‌, বেশী নিস্‌নে যেন।

না মা, টাকা চাইনে। বল, তুমি শুন্‌বে?

মা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, টাকা চাইনে? তবে কি কথা রে?

ললিত আর একটু কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, কেষ্টমামাকে একবার আস্‌তে দেবে? ঘরে ঢুক্‌বে না—ঐ দোরগোড়া থেকে একটিবার তোমাকে দেখেই চলে যাবে। কালকেও বাইরে এসে বসেছিল, আজকেও এসে বসে আছে।

হেমাঙ্গিনী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন—যা যা ললিত, এখ্‌খুনি ডেকে নিয়ে আয়—আহা হা, বসে আছে, তোরা কেউ আমাকে জানাস্‌নি রে?

ভয়ে আস্‌তে চায় না যে, বলিয়া ললিত চলিয়া গেল। মিনিট-খানেক পরে কেষ্ট ঘরে ঢুকিয়া মাটির দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া দেয়াল ঠেস দিয়া দাঁড়াইল।

হেমাঙ্গিনী ডাকিলেন, এস দাদা, এস।

কেষ্ট তেমনি ভাবে স্থির হইয়া রহিল। তিনি নিজে তখন উঠিয়া আসিয়া কেষ্টর হাত ধরিয়া বিছানায় লইয়া গেলেন। পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিলেন, হ্যাঁরে কেষ্ট, বকেছিলুম ব'লে তোর মেজদিদিকে ভুলে গেছিস্ বুঝি ?

সহসা কেষ্ট ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। হেমাঙ্গিনী কিছু আশ্চর্য্য হইলেন, কারণ কখনও কেহ তাহাকে কাঁদিতে দেখে না। অনেক দুঃখ-কষ্ট যাতনা দিলেও সে ঘাড় হেঁট করিয়া নিঃশব্দে থাকে, লোকজনের সুমুখে চোখের জল ফেলে না। তাহার এই স্বভাবটি হেমাঙ্গিনী জানিতেন বলিয়াই বড় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, ছি, কান্না কিসের ? বেটাছেলেকে চোখের জল ফেলতে আছে কি ?

প্রত্যুত্তরে কেষ্ট কোঁচার খুঁট মুখে গুঁজিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় কান্না রোধ করিতে করিতে বলিল, ডাক্তার বলে যে, বুকে সর্দ্দি বসেছে ?

হেমাঙ্গিনী হাসিলেন—এই জন্যে ? ছি ছি ! কি ছেলেমানুষ তুই রে ? বলিতে বলিতে তাঁর নিজের চোখ দিয়াও টপ্ টপ্ করিয়া দু-ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। বাঁ হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া তাহার মাথায় একটা হাত দিয়া কৌতুক করিয়া বলিলেন, সর্দ্দি বসেছে—বস্‌লেই বা রে ! যদি মরি, তুই

আর ললিত কাঁধে ক'রে গঙ্গায় দিয়ে আসবি—কেমন, পার্‌বিনে ?

বলি মেজবৌ, কেমন আছ আজ ?—বলিয়া বড়বৌ দোর-গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকাল কেষ্টর পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, এই যে ইনি এসে হাজির হয়েছেন। আবার ওকি ? মেজগিন্নীর কাছে কেঁদে সোহাগ করা হচ্ছে যে ! ন্যাকা আমার, কত ফন্দিই জানে !

ক্লান্তিবশতঃ হেমাঙ্গিনী এইমাত্র বালিশে হেলান দিয়া কাত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তীরের মত সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, দিদি, আমার ছ-সাত দিন জ্বর, তোমার পায়ে পড়ি, আজ তুমি যাও।

কাদম্বিনী প্রথমটা থতমত খাইয়া গেলেন ; কিন্তু পরক্ষণে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, তোমাকে ত বলিনি মেজবৌ। নিজের ভাইকে শাসন কচ্চি, তুমি অমন মারমুখী হ'য়ে উঠ্‌চ কেন ?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, শাসন ত রাত্রিদিনই চল্‌চে—বাড়ী গিয়ে কোরো, এখানে আমার সাম্‌নে কর্‌বার দরকার নেই, কর্‌তেও দেব না।

কেন, তুমি কি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে না কি ?

হেমাঙ্গিনী হাত জোড় করিয়া বলিলেন, আমার বড় অসুখ দিদি ; তোমার দুটি পায়ে পড়ি, হয় চুপ কর—নয় যাও।

কাদম্বিনী বলিলেন, নিজের ভাইকে শাসন কর্‌তে পাব না ?

হেমাঙ্গিনী জবাব দিলেন, বাড়ী গিয়ে কর গে।

সে আজ ভাল করেই হবে। আমার নামে লাগান ভাঙান আজ বার করব—বদ্‌মাইস্ মিথ্যুক কোথাকার! বল্‌লুম গরুর দড়ি নেই কেষ্টা, দু আঁটি পাট কেটে দে—না 'দিদি তোমার পায়ে পড়ি, পুতুল-নাচ দেখে আসি—' এই বুঝি পুতুলের নাচ হচ্চে রে! বলিয়া কাদম্বিনী গুম্ গুম্ করিয়া পা ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

হেমাঙ্গিনী কতক্ষণ কাঠের মত বসিয়া থাকিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, কেন তুই পুতুল-নাচ দেখতে গেলিনি কেষ্ট? গেলে ত আর এই সব হ'ত না! আস্‌তে যখন তোকে ওরা দেয় না ভাই, তখন আর আসিস্‌নে আমার কাছে।

কেষ্ট আর কাথাটি না কহিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমাদের গাঁয়ের বিশালাক্ষী ঠাকুর বড় জাগ্রত মেজদি, পূজো দিলে অসুখ-বিসুখ সেরে যায়। দাও না মেজদি!

এই মাত্র নিরর্থক ঝগড়া হইয়া যাওয়ায় হেমাঙ্গিনীর মনটা ভারি বিগড়াইয়া গিয়াছিল, ঝগড়া-ঝাঁটি ত হয়ই—সে জন্য নয়। এমন একটা রসাল ছুতা পাইয়া এই হতভাগার দুর্দ্দশা যে কিরূপ হইবে, আসলে সেই কথাটা মনে মনে তোলপাড় করিয়া তাঁহার বুকের ভিতরটা ক্ষোভে ও নিরুপায় আক্রোশে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কেষ্ট ফিরিয়া আসিতেই হেমাঙ্গিনী উঠিয়া বসিলেন এবং কাছে বসাইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। চোখ মুছিয়া বলিলেন, আমি ভাল

হ'য়ে তোকে লুকিয়ে পূজো দিতে পাঠিয়ে দেব। পার্‌বি একলা যেতে?

কেষ্ট উৎসাহে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, একলা যেতে খুব পারব। তুমি আজকে আমাকে একটা টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দাও না। মেজদি—আমি কাল সকালেই পূজো দিয়ে তোমাকে প্রসাদ এনে দেব। সে খেলে তক্ষুণি অসুখ সেরে যাবে! দাও না মেজদি আজকেই পাঠিয়ে?

হেমাঙ্গিনী দেখিলেন, তাহার আর সবুর সয় না। বলিলেন, কিন্তু কাল ফিরে এলে তোকে যে এরা ভারি মার্‌বে। মার-ধোরের কথা শুনিয়া প্রথমটা কেষ্ট দমিয়া গেল, কিন্তু, পরক্ষণেই প্রফুল্ল হইয়া কহিল, মারুকগে। তোমার অসুখ সেরে যাবে ত!

আবার তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। বলিলেন, হ্যাঁরে কেষ্ট, আমি তোর কেউ নই, তবে আমার জন্যে এত মাথা ব্যথা কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর কেষ্ট কোথায় পাইবে? সে কি করিয়া বুঝাইবে, তাহার পীড়িত আর্ত্ত হৃদয় দিবারাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার মাকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে! একটুখানি মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তোমার অসুখ যে সার্‌চে না মেজদি—বুকে সর্দ্দি বসেচে যে!

হেমাঙ্গিনী এবার একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আমার বুকে সর্দ্দি বসেচে তাতে তোর কি? তোর এত ভাবনা হয় কেন?

কেষ্ট আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, ভাবনা হবে না মেজদি, বুকে সর্দ্দি বসা যে বড় খারাপ। অসুখ যদি বেড়ে যায়—তা হ'লে?

তা হ'লে তোকে ডেকে পাঠাব ; কিন্তু না ডেকে পাঠালে আর আসিস্‌নে ভাই !

কেন মেজদি ?

হেমাঙ্গিনী দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, তোকে আর আমি এখানে আসতে দেব না। না ডেকে পাঠালেও যদি আসিস্ তা হ'লে ভারি রাগ করব।

কেষ্ট মুখপানে চাহিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, তা হ'লে বল, কাল সকালে কখন ডেকে পাঠাবে ?

কাল সকালেই আবার তোর আসা চাই ?

কেষ্ট অপ্রতিভ হইয়া বলিল, আচ্ছা, সকালে না হয় দুপুর-বেলায় আসব—না মেজদি ? তাহার চোখে মুখে এমনই একটা ব্যাকুল অনুনয় ফুটিয়া উঠিল যে, হেমাঙ্গিনী মনে মনে ব্যথা পাইলেন ; কিন্তু আর ত তাঁহার কঠিন না হইলে নয়। সবাই মিলিয়া এই নিরীহ একান্ত অসহায় বালকের উপর যে নির্য্যাতন সুরু করিয়াছে,কোন কারণেই আর ত তাহা বাড়াইয়া দেওয়া চলে না। সে হয় ত সহিতে পারে ; মেজদির কাছে আসা-যাওয়া করিবার দণ্ড যত গুরুতর হোক্ সে হয় ত সহ্য করিতে পিছাইবে না ; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি নিজে কি করিয়া সহিবেন ?

হেমাঙ্গিনীর চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল ; তথাপি তিনি মুখ ফিরাইয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন, বিরক্ত করিসনে কেষ্ট, যা এখান থেকে। ডেকে পাঠালে আসিস্, নইলে যখন তখন এসে আমাকে বিরক্ত করিস্‌নে।

না, বিরক্ত করিনি ত, বলিয়া ভীত লজ্জিত মুখখানি হেঁট করিয়া তাড়াতাড়ি কেষ্ট উঠিয়া গেল।

এইবার হেমাঙ্গিনীর দুই চোখ বাহিয়া প্রস্রবণের মত জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি সুস্পষ্ট দেখিতে লাগিলেন, এই নিরুপায় অনাথ ছেলেটা মা হারাইয়া তাঁকেই মা বলিয়া আশ্রয় করিতেছে। তাঁরই আঁচলের অল্প-একটুখানি মাথায় টানিয়া লইবার জন্য কাঙালের মত কি করিয়াই না বেড়াইতেছে!

হেমাঙ্গিনী চোখ মুছিয়া মনে মনে বলিলেন, কেষ্ট, মুখখানি অমন ক'রে গেলি ভাই, কিন্তু তোর এই মেজদি যে তোর চেয়েও নিরুপায়। তোকে জোর ক'রে বুকে টেনে আনবে, সে ক্ষমতা তার নেই ভাই।

উমা আসিয়া কহিল, মা কাল কেষ্টমামা তাগাদায় না গিয়ে, তোমার কাছে এসে বসেছিল ব'লে, জ্যাঠামশায় এমন মার মারলেন যে, নাক দি—

হেমাঙ্গিনী ধমকাইয়া উঠিলেন—আচ্ছা—হয়েচে—হয়েচে—যা তুই এখান থেকে! অকস্মাৎ ধমকানি খাইয়া উমা চমকাইয়া উঠিল। আর কোন কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল; মা ডাকিয়া বলিলেন, শোন্ রে! নাক দিয়ে কি খুব রক্ত পড়েছিল?

উমা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না খুব নয়, একটুখানি।

আচ্ছা তুই যা। উমা কপাটের কাছে আসিয়াই বলিয়া উঠিল, মা, এই যে কেষ্টমামা দাঁড়িয়ে রয়েচে।

কেষ্ট শুনিতে পাইল। বোধ করি ইহাকে অভ্যর্থনা মনে

করিয়া মুখ বাড়াইয়া সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল, কেমন আছ মেজদি ?

ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে হেমাঙ্গিনী ক্ষিপ্তবৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—কেন এসেচিস্ এখানে ? যা, যা বল্‌চি শীগ্‌গির। দূর হ' বল্‌চি—

কেষ্ট মূঢ়ের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল—হেমাঙ্গিনী অধিকতর তীক্ষ্ণ তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, তবু দাঁড়িয়ে রইলি হতভাগা—গেলিনে ?

কেষ্ট মুখ নামাইয়া শুধু 'যাচ্চি' বলিয়াই চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে হেমাঙ্গিনী নির্জ্জীবের মত বিছানার একধারে শুইয়া পড়িয়া অস্ফুট ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন, একশ বার বলি হতভাগাকে, আসিস্‌নে আমার কাছে—তবু 'মেজদি' ! শিবুকে ব'লে দিস্ ত উমা, ওকে না আর ঢুকতে দেয়।

উমা জবাব দিল না, ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। রাত্রে হেমাঙ্গিনী স্বামীকে ডাকাইয়া আনিয়া কাঁদ কাঁদ গলায় বলিলেন, কোন দিন ত তোমার কাছে কিছু চাই নি—আজ এই অসুখের উপর একটা ভিক্ষা চাই'চ, দেবে ?

বিপিন সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কি চাই ?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, কেষ্টকে আমাকে দাও—ও বেচারি বড় দুঃখী—মা বাপ নেই—ওকে ওরা মেরে ফেল্‌চে,—এ আর আমি চোখে দেখ্‌তে পার্‌চিনে।

বিপিন মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তা হ'লে চোখ বুজে থাকলেই ত হয় ?

স্বামীর এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপ হেমাঙ্গিনীকে শূল দিয়া বিঁধিল। অন্য কোন অবস্থায় তিনি ইহা সহিতে পারিতেন না, কিন্তু আজ নাকি তাঁহার দুঃখে প্রাণ বাহির হইতেছিল, তাই সহ্য করিয়া লইয়া হাত যোড় করিয়া বলিলেন, তোমার দিব্বি ক'রে বল্‌চি, ওকে আমি নিজের ছেলের মত ভালবেসেচি। দাও আমাকে —মানুষ করি—খাওয়াই-পরাই—তার পরে যা ইচ্ছে হয় তোমাদের, তাই ক'রো। বড় হ'লে আমি একটি কথাও ক'ব না।

বিপিন একটুখানি নরম হইয়া বলিলেন, ও কি আমার গোলার ধান-চাল যে তোমাকে এনে দেব? পরের ভাই, পরের বাড়ী এসেচে—তোমার মাঝখানে প'ড়ে এত দরদ কিসের জন্যে?

হেমাঙ্গিনী কাঁদিয়া ফেলিলেন। খানিক পরে চোখ মুছিয়া বলিলেন, তুমি ইচ্ছে ক'র্‌লে বট্‌ঠাকুরকে ব'লে দিদিকে ব'লে স্বচ্ছন্দে আন্‌তে পার। তোমার দুটি পায়ে পড়্‌চি, দাও তাকে।

বিপিন বলিলেন, আচ্ছা, তাই যদি হয়, আমিই বা এত বড় মানুষ কিসে যে, তাকে প্রতিপালন করব?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, তুমি আগে আমার একটা তুচ্ছ কথাও ঠেল্‌তে না, এখন কি অপরাধ ক'রেচি যে, যখন এমন ক'রে জানাচ্চি—বল্‌চি, সত্যিই আমার প্রাণ বার হ'য়ে যাচ্চে—তবু এই সামান্য কথাটা রাখ্‌তে চাইচ না? সে দুর্ভাগা ব'লে কি তোমরা সকলে মিলে তাকে মেরে ফেল্‌বে? আমি তাকে আমার কাছে আসতে বল্‌ব. দেখি ওঁরা কি করেন।

বিপিন এবার রুষ্ট হইলেন। বলিলেন, আমি খাওয়াতে পার্‌ব না।

হেমাঙ্গিনী কহিলেন, আমি পার্‌ব। আমি কি বাড়ীর কেউ নয় যে নিজের ছেলেকে খাওয়াতে-পরাতে পারব না? আমি কালই তাকে আমার কাছে এনে রাখব। দিদিরা জোর করেন ত আমি তাকে থানায় দারোগার কাছে পাঠিয়ে দেব।

স্ত্রীর কথা শুনিয়া বিপিন ক্রোধে অভিমানে ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া থাকিয়া বলিলেন, আচ্ছা, সে দেখা যাবে। —বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

পরদিন প্রভাত হইতে বৃষ্টি পড়িতেছিল। হেমঙ্গিনী জানালাটা খুলিয়া দিয়া আকাশের পানে চাহিয়াছিলেন, সহসা পাঁচুগোপালের উচ্চ কণ্ঠস্বর কানে গেল। সে চেঁচাইয়া বলিতে-ছিল, মা, তোমার গুণধর ভাই জলে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে এসে হাজির হয়েচে।

খ্যাংরা কোথায় রে? যাচ্ছি আমি, বলিয়া কাদম্বিনী হুঙ্কার দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া মাথায় গামছা দিয়া দ্রুতপদে সদর বাড়ীতে ছুটিয়া গেলেন।

হেমাঙ্গিনীর বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। ললিতকে ডাকিয়া বলিলেন, যা ত বাবা ও বাড়ীর সদরে। দেখ্ ত, তোর কেষ্টমামা কোথা থেকে এল?

ললিত ছুটিয়া চলিয়া গেল এবং খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, পাঁচুদা তাকে নাড়ুগোপাল ক'রে মাথায় দুটো থান ইঁট দিয়ে বসিয়ে রেখেচে।

হেমাঙ্গিনী শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করেছিল সে?

ললিত বলিল, কাল দুপুর-বেলা তাকে তাগাদা করতে পাঠিয়েছিল, গয়লাদের কাছে; তিন টাকা আদায় ক'রে নিয়ে পালিয়েছিল, সব খরচ ক'রে এই আসচে।

হেমাঙ্গিনী বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, কে বল্‌লে, সে টাকা আদায় করেছিল?

লক্ষ্মণ গয়লা নিজে এসে বলে গেছে, বলিয়া ললিত পড়িতে চলিয়া গেল। ঘন্টা দুই-তিন আর কোন গোলযোগ শোনা গেল না। বেলা দশটার সময় রাঁধুনী খান-কতক রুটি দিয়া গিয়াছিল, হেমাঙ্গিনী বসিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমনি সময়ে তাঁহারই ঘরের বাহিরে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গেল। বড়গিন্নীর পশ্চাতে পাঁচুগোপাল কেষ্টর কান ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া আনিতেছে, সঙ্গে বড়কর্ত্তাও আছেন। মেজকর্ত্তাকেও আনিবার জন্য দোকানে লোক পাঠান হইয়াছে।

হেমাঙ্গিনী শশব্যস্তে মাথায় কাপড় দিয়া ঘরের একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইতেই বড়কর্ত্তা তীব্র কটুকণ্ঠে সুরু করিয়া দিলেন, তোমার জন্যে আর ত আমরা বাড়ীতে টিঁকতে পারিনে মেজবৌমা। বিপিনকে বল, আমাদের বাড়ীর দামটা ফেলে দিক্, আমরা আর কোথাও উঠে যাই।

হেমাঙ্গিনী বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন বড়গিন্নী যুদ্ধপরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া দ্বারের ঠিক সুমুখে সরিয়া আসিয়া, হাত মুখ নাড়িয়া বলিলেন, মেজবৌ, আমি বড় জা, তা আমাকে কুকুর শিয়াল

মনে কর—তা ভালই কব কিন্তু হাজার দিন বলেচি, মিছে লোক-দেখান আহ্লাদ দিয়ে, আমার ভায়ের মাথাটি খেয়ো না—কেমন, এখন ঘটল ত ? ওগো, দুদিন সোহাগ করা সহজ কিন্তু চিরকালের ভারটি ত তুমি নেবে না ; সে ত আমাকেই বইতে হবে ?

ইহা যে কটূক্তি এবং আক্রমণ, তাহাই শুধু হেমাঙ্গিনী বুঝিলেন—আর কিছু নয়। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েচে ?

কাদম্বিনী আরও বেশী হাতমুখ নাড়িয়া কহিলেন, বেশ হয়েচে—খুব চমৎকার হয়েচে। তোমার শেখানোর গুণে আদায়ী টাকা চুরি করতে শিখেচে—আর দুদিন কাছে ডেকে আরো দুটো শলাপরামর্শ দাও, তা হ'লে সিন্দুক ভাঙতে, সিঁদ কাটতেও শিখ্‌বে।

একে হেমাঙ্গিনী পীড়িত, তাহার উপর এই কদর্য্য বিদ্রূপ ও মিথ্যা অভিযোগ—আজ তিনি জ্ঞান হারাইলেন। ইতিপূর্ব্বে কখনও কোন কারণে ভাশুরের সুমুখে তিনি কথা কহেন নাই ; কিন্তু আজ থাকিতে পারিলেন না। মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, আমি কি তাকে চুরি-ডাকাতি কর্‌তে শিখিয়ে দিয়েছি দিদি ?

কাদম্বিনী স্বচ্ছন্দে বলিলেন, কেমন ক'রে জান্‌ব, কি তুমি শিখিয়ে দিয়েচ, না দিয়েচ। এ স্বভাব ত আগে ছিল না, এখনই বা হ'ল কেন ? এত লুকোচুরির কথাবর্ত্তাই বা তোমাদের কি আর এত আহ্লাদ দেওয়াই বা কি জন্যে ? কতদিনের পুঞ্জীভূত আবদ্ধ বিদ্বেষরাশি যে এই একটু পথ পাইয়া বাহির হইয়া আসিল, তাহা যিনি সব দেখেন, তিনি দেখিতে পাইলেন।

মুহূর্ত্তকালের জন্য হেমাঙ্গিনী হতজ্ঞানের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এমন নিষ্ঠুর আঘাত, এত বড় নির্লজ্জ অপমান, মানুষ মানুষকে যে করিতে পারে, ইহা যেন তাঁহার মাথায় প্রবেশ করিল না; কিন্তু ঐ মুহূর্ত্তকালের জন্য। পরক্ষণেই তিনি মর্ম্মান্তিক আহত সিংহীর মত দুই চোখে আগুন জ্বালিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। ভাশুরকে সুমুখে দেখিয়া মাথায় কাপড় আর একটু টানিয়া দিলেন, কিন্তু রাগ সামলাইতে পারিলেন না। বড় জাকে সম্বোধন করিয়া মৃদু অথচ অতি কঠোর স্বরে বলিলেন, তুমি এত বড় চামার যে, তোমার সঙ্গে কথা কইতেও আমার ঘৃণা বোধ হয়। তুমি এত বড় বেহায়া মেয়ে-মানুষ যে, ঐ ছোঁড়াটাকে ভাই ব'লেও পরিচয় দিচ্ছ। মানুষ জানোয়ার পুষলে তাকেও পেট ভ'রে খেতে দেয়, কিন্তু ঐ হতভাগাটাকে দিয়ে যত রকমের ছোট কাজ করিয়ে নিয়েও তোমরা আজ পর্য্যন্ত একদিন পেট ভ'রে খেতে দাও না। আমি না থাকলে এতদিনে ও না খেতে পেয়েই ম'রে যেত। ও পেটের জ্বালায় শুধু ছুটে আসে আমার কাছে, সোহাগ আহ্লাদ করতে আসে না।

বড় জা বলিলেন, আমরা খেতে দিইনে, শুধু খাটিয়ে নিই,—আর তুমি ওকে খেতে দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেচ?

হেমাঙ্গিনী জবাব দিলেন, ঠিক তাই। আজ পর্য্যন্ত কখনও ওকে দুবেলা তোমরা খেতে দাওনি—কেবল মার-ধোর করেচ, আর যত পেরেচ, খাটিয়ে নিয়েচ। তোমাদের ভয়ে আমি হাজার দিন ওকে আস্‌তে বারণ করেচি, কিন্তু ক্ষিদে বরদাস্ত

কর্‌তে পারে না,আর আমার কাছে পেট ভ'রে দুটো খেতে পায় ব'লেই ছুটে ছুটে আসে—চুরি-ডাকাতির পরামর্শ নিতে আসে না : কিন্তু তোমরা এত বড় হিংসুক যে, তাও চোখে দেখতে পার না।

এবার ভাশুর জবাব দিলেন। কেষ্টকে সুমুখে টানিয়া আনিয়া তাহার কোঁচার খুঁট খুলিয়া একটা কলাপাতার ঠোঙা বাহির করিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, হিংসুক আমরা, কেন যে ওকে ভালো চোখে দেখ্‌তে পারিনে, তা তুমিই নিজের চোখে দ্যাখো। মেজবৌমা, তোমার শেখানোর গুণেই ও আমার টাকা চুরি ক'রে তোমার ভালোর জন্যে কোন্‌ একটা ঠাকুরের পূজো দিয়ে প্রসাদ এনেচে—এই নাও ; বলিয়া তিনি গোটা-দুই সন্দেশ ও ফুল-বেলপাতা ঠোঙার ভিতর হইতে বাহির করিয়া দেখাইলেন।

কাদম্বিনী চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, মা গো! কি মিটমিটে সয়তান, কি ধড়িবাজ ছেলে! বেশ ত মেজবৌ, এখন তুমিই বল না, কি মতলবে ও চুরি করেচে? ও কি আমার ভালোর জন্যে?

হেমাঙ্গিনী ক্রোধে জ্ঞান হারাইলেন। একে তাঁহার অসুস্থ শরীর, তাহাতে এই সমস্ত মিথ্যা অভিযোগ ; তিনি দ্রুতপদে কেষ্টর সম্মুখীন হইয়া তাহার দুই গালে সশব্দে চড় কসাইয়া দিয়া কহিলেন, বদমাইস চোর, আমি তোকে চুরি কর্‌তে শিখিয়ে দিয়েচি? কতদিন তোকে আমার বাড়ী ঢুক্‌তে বারণ করেচি, কতবার তোকে তাড়িয়ে দিয়েছি? আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, তুই চুরির মতলবেই যখন তখন এসে উঁকি মেরে দেখ্‌তিস্‌।

ইতিপূর্ব্বেই বাড়ীর সকলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। শিবু কহিল, আমি নিজের চক্ষে দেখেচি মা, পরশু রাত্তিরে ও তোমার ঘরের সুমুখে আঁধারে দাঁড়িয়েছিল, আমাকে দেখেই ছুটে পালিয়ে গেল। আমি এসে না পড়লে নিশ্চয় তোমার ঘরে ঢুকে চুরি কর্‌ত।

পাঁচুগোপাল বলিল, জানে মেজখুড়িমার অসুখ শরীর—সন্ধ্যা হ'লেই ঘুমিয়ে পড়েন—ও কি কম চালাক!

মেজবৌয়ের কেষ্টর প্রতি আজকার ব্যবহারে কাদম্বিনী যেরূপ প্রসন্ন হইলেন, এই ষোল বৎসরের মধ্যে কখনও এরূপ হন নাই। অত্যন্ত খুসি হইয়া কহিলেন, ভিজে বেড়াল! কেমন ক'রে জানব মেজবৌ, তুমি ওকে বাড়ী ঢুকতেও বারণ করেচ! ও বলে বেড়ায় মেজদি আমাকে মায়ের চেয়ে ভালবাসে। ঠোঙা-শুদ্ধ নির্ম্মাল্য টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, টাকা তিনটে চুরি ক'রে কোথা থেকে দুটো ফুলটুল কুড়িয়ে এনেচে।

বাড়ী লইয়া গিয়া বড়কর্ত্তা চোরের শাস্তি সুরু করিলেন। সে কি নির্দ্দয় প্রহার! কেষ্ট কথাও কহে না, কাঁদেও না। এদিকে মারিলে ওদিকে মুখ ফিরায়, ওদিকে মারিলে এদিকে মুখ ফিরায়। ভারী গাড়ীশুদ্ধ গরু কাদায় পড়িয়া যেমন করিয়া মার খায়, তেমনি করিয়া কেষ্ট নিঃশব্দে মার খাইল। এমন কি কাদম্বিনী পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন, হাঁ, মার খাইতে শিখিয়াছিল বটে; কিন্তু ভগবান জানেন, এখানে আসার পূর্ব্বে, নিরীহ স্বভাবের গুণে কখন কেহ তাহার গায়ে হাত তুলে নাই।

হেমাঙ্গিনী নিজের ঘরের ভিতর সমস্ত জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া কাঠের মূর্ত্তির মত বসিয়াছিলেন। উমা মার দেখিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, জ্যাঠাইমা বললেন, কেষ্ট-মামা বড় হ'লে ডাকাত হবে! ওদের গাঁয়ে কি ঠাকুর আছে—

উমা?

মায়ের অশ্রুবিকৃত ভগ্ন কণ্ঠস্বরে উমা চম্‌কাইয়া উঠিল। কাছে আসিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কেন মা?

হাঁ রে, এখনো কি তাকে সবাই মিলে মার্‌চে? বলিয়াই তিনি মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

মায়ের কান্না দেখিয়া উমাও কাঁদিয়া ফেলিল। তার পর কাছে বসিয়া নিজের আঁচল দিয়া, জননীর চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, পেসন্নর মা কেষ্টমামাকে বাইরে টেনে নিয়ে গেছে।

হেমাঙ্গিনী আর কথা কহিলেন না, সেইখানে তেমনি করিয়াই পড়িয়া রহিলেন। বেলা দুইটা-তিনটার সময় সহসা কম্প দিয়া ভয়ানক জ্বর আসিল। আজ অনেক দিনের পর পথ্য করিতে বসিয়াছিলেন—সে খাবার তখনও একধারে পড়িয়া শুকাইতে লাগিল। সন্ধ্যার পর বিপিন ও-বাড়ীতে বৌঠানের মুখে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া ক্রোধভরে স্ত্রীর ঘরে ঢুকিতেছিলেন উমা কাছে আসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, মা জ্বরে অজ্ঞান হয়ে আছেন।

বিপিন চম্‌কাইয়া উঠিলেন—সে কি রে, আজ তিন-চারদিন জ্বর ছিল না ত!

বিপিন মনে মনে স্ত্রীকে অতিশয় ভালবাসিতেন · কত যে বাসিতেন তাহা বছর চার-পাঁচ পূর্ব্বে দাদাদের সহিত পৃথক হইবার সময় জানা গিয়াছিল। ব্যাকুল হইয়া ঘরে ঢুকিয়াই দেখিলেন, তখনও তিনি মাটির উপর পড়িয়া আছেন। ব্যস্ত হইয়া শয্যায় তুলিবার জন্য গায়ে হাত দিতেই হেমাঙ্গিনী চোখ মেলিয়া, একমুহূর্ত্ত স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া,অকস্মাৎ দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—কেষ্টকে আশ্রয় দাও, নইলে, এ জ্বর আমার সার্‌বে না। মা দুর্গা আমাকে কিছুতে মাফ কর্‌বেন না।

বিপিন পা ছাড়াইয়া লইয়া, কাছে বসিয়া স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, দেবে ?

বিপিন সজল চক্ষু হাত দিয়া মুছিয়া বলিলেন, তুমি যা চাও, তাই হবে, তুমি ভাল হয়ে ওঠ।

হেমাঙ্গিনী আর কিছু বলিলেন না, বিছানায় উঠিয়া শুইয়া পড়িলেন। জ্বর রাত্রেই ছাড়িয়া গেল, পরদিন সকালে উঠিয়া বিপিন ইহা লক্ষ্য করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। হাত মুখ ধুইয়া কিছু জলযোগ করিয়া দোকানে বাহির হইতেছিলেন, হেমাঙ্গিনী আসিয়া বলিলেন, মার খেয়ে কেষ্টর ভারি জ্বর হয়েছে, তাকে আমি আমার কাছে নিয়ে আস্‌চি।

বিপিন মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তাকে এ বাড়ীতে আনবার দরকার কি ? যেখানে আছে, সেইখানেই থাক্ না ?

হেমাঙ্গিনী ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া বলিলেন, কাল রাত্রে যে তুমি কথা দিলে, তাকে আশ্রয় দেবে ?

বিপিন অবজ্ঞাভরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ—সে কে যে, তাকে ঘরে এনে পুষ্‌তে হবে ? তুমিও যেমন !

কাল রাত্রে স্ত্রীকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখিয়া যাহা স্বীকার করিয়াছিলেন, আজ সকালে তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া তাহাই তুচ্ছ করিয়া দিলেন। ছাতাটা বগলে চাপিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, পাগলামি ক'র না—দাদারা ভারি চ'টে যাবেন।

হেমাঙ্গিনী শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, দাদারা চ'টে গিয়ে কি তাকে খুন ক'রে ফেল্‌তে পারেন, না, আমি নিয়ে এলে সংসারে কেউ তাকে আটকে রাখতে পারে ? আমার তুটি সন্তান ছিল, কাল থেকে তিনটি হ'য়েচে। আমি কেষ্টর মা !

আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে, বলিয়া বিপিন চলিয়া যাইতেছিলেন, হেমাঙ্গিনী সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, এ বাড়ীতে তাকে আনতে দেবে না ?

সর, সর—কি পাগলামি কর ? বলিয়া বিপিন চোখ রাঙাইয়া চলিয়া গেলেন।

হেমাঙ্গিনী ডাকিলেন, শিবু, একটা গরুর গাড়ী ডেকে আন, আমি বাপের বাড়ী যাব।

বিপিন শুনিতে পাইয়া মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, ইস্‌ ! ভয় দেখান হ'চ্চে। তার পর দোকানে চলিয়া গেলেন।

কেষ্ট চণ্ডীমণ্ডপের একধারে ছেঁড়া মাদুরের উপর জ্বরে, গায়ের ব্যথায় এবং বোধ করি, বুকের ব্যথায় আচ্ছন্নের মত পড়িয়াছিল। হেমাঙ্গিনী ডাকিলেন, কেষ্ট!

কেষ্ট যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল—এইভাবে তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, মেজদি? পরক্ষণে সলজ্জ হাসিতে তাহার সমস্ত মুখ ভরিয়া গেল। যেন তাহার কোন অসুখ-বিসুখ নাই, এইভাবে মহা উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, কোঁচা দিয়া ছেঁড়া মাদুর ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, ব'স।

হেমাঙ্গিনী তাহার হাত ধরিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলেন, আর ত বস্‌ব না দাদা, আয় আমার সঙ্গে। আমাকে বাপের বাড়ী আজ তোকে পৌঁছে দিতে হবে যে।

চল, বলিয়া কেষ্ট তাহার ভাঙা ছড়িটা বগলে চাপিয়া লইল এবং ছেঁড়া গামছাখানা কাঁধে ফেলিল।

নিজেদের বাড়ীর সদরে গো-যান দাঁড়াইয়াছিল, হেমাঙ্গিনী কেষ্টকে লইয়া চড়িয়া বসিলেন। গাড়ী যখন গ্রাম ছাড়াইয়া গিয়াছে, তখন পশ্চাতে ডাকাডাকি চীৎকারে গাড়োয়ান গাড়ী থামাইল। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, আরক্ত মুখে বিপিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সভয়ে প্রশ্ন করিলেন, কোথায় যাও মেজবৌ?

হেমাঙ্গিনী কেষ্টকে দেখাইয়া বলিলেন, এদের গ্রামে।

কখন ফির্‌বে?

হেমাঙ্গিনী গম্ভীর দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন, ভগবান যখন ফেরাবেন, তখনই ফির্ব।

তার মানে ?

হেমাঙ্গিনী পুনরায় কেষ্টকে দেখাইয়া বলিলেন, কখনও যদি কোথাও এর আশ্রয় জোটে, তবেই ত একা ফিরে আস্তে পার্ব, না হয়, একে নিয়েই থাক্তে হবে।

বিপিনের মনে পড়িল, সে দিনেও স্ত্রীর এম্নি মুখের ভাব দেখিয়াছিলেন এবং এমনি কণ্ঠস্বরই শুনিয়াছিলেন, যে দিন মতি কামারের নিঃসহায় ভাগিনেয়ের বাগানখানি বাঁচাইবার জন্য তিনি একাকী সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। মনে পড়িল, এ মেজবৌ সে নয়, যাহাকে চোখ রাঙাইয়া টলান যায়।

বিপিন নম্র স্বরে বলিলেন, মাপ কর মেজবৌ, বাড়ী চল।

হেমাঙ্গিনী হাত জোড় করিয়া কহিলেন, আমাকে তুমি মাপ কর—কাজ না সেরে আমি কোনমতেই বাড়ী ফির্তে পার্ব না।

বিপিন আর এক মুহূর্ত্ত স্ত্রীর শান্ত দৃঢ় মুখের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা সুমুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কেষ্টর ডান হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, কেষ্ট, তোর মেজ-দিকে তুই বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে আয় ভাই, শপথ কচ্চি, আমি বেঁচে থাক্তে তোদের দুই ভাই-বোনকে আজ থেকে কেউ পৃথক্ কর্তে পারবে না। আয় ভাই, তোর মেজদিকে নিয়ে আয়।

দর্প-চূর্ণ

১

সন্ধ্যার পর ইন্দুমতী বিশেষ একটু সাজ-সজ্জা করিয়া তাহার স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, কি হচ্ছে?

নরেন্দ্র একখানি বাঙ্গলা মাসিকপত্র পড়িতেছিল, মুখ তুলিয়া নিঃশব্দে ক্ষণকাল স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া, সেখানি হাতে তুলিয়া দিল।

ইন্দু খোলা পাতাটার উপর চোখ বুলাইয়া লইয়া, জোড়া ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া, বিস্ময় প্রকাশ করিল—ইস, এ যে কবিতা দেখ্‌চি। তা বেশ—ব'সে না থাকি, বেগার খাটি। দেখি এখানা কি কাগজ? 'সরস্বতী'? 'স্বপ্রকাশ' ছাপালে না বুঝি?

নরেন্দ্রের দৃষ্টি ব্যথায় ম্লান হইয়া আসিল।

ইন্দু পুনরায় প্রশ্ন করিল, 'স্বপ্রকাশ' ফিরিয়ে দিলে?

সেখানে পাঠাইনি।

পাঠিয়ে একবার দেখ্‌লে না কেন? 'স্বপ্রকাশ', 'সরস্বতী' নয়, তাদের কাণ্ডজ্ঞান আছে। এই জন্যেই আমি যা তা কাগজ কখ্‌খনো পড়িনে।

একটু হাসিয়া ইন্দু আবার কহিল, আচ্ছা, নিজের লেখা নিজেই খুব মন দিয়ে পড়। ভাল কথা,—আজ শনিবার, ও-বাড়ীর ঠাকুরঝিকে নিয়ে বায়স্কোপ দেখ্‌তে যাচ্চি। কমলা

ঘুমিয়ে পড়েছে ; কাব্যের ফাঁকে মেয়েটার দিকেও একটু নজর রেখো। চল্‌লুম।

নরেন্দ্র কাগজখানি বন্ধ করিয়া টেবিলের একধারে রাখিয়া দিয়া বলিল, যাও।

ইন্দু চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ একটা গভীর নিশ্বাস কানে যাইতেই সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আচ্ছা, আমি কিছু একটা কর্‌তে চাইলেই তুমি অমন ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল কেন বল ত? এতই যদি তোমার দুঃখের জ্বালা, মুখ-ফুটে বল না কেন, আমি বাবাকে চিঠি লিখে যা হোক একটা উপায় করি।

নরেন্দ্র মুহূর্ত্তকাল মুখ তুলিয়া, ইন্দুর দিকে চাহিয়া রহিল। মনে হইল যেন সে কিছু বলিবে ; কিন্তু কিছুই বলিল না, নীরবে মুখ নত করিল।

নরেন্দ্রের মামাত ভগিনী বিমলা ইন্দুর সখী। ও-রাস্তার মোড়ের উপরেই তাহার বাড়ী। ইন্দু গাড়ী দাঁড় করাইয়া, ভিতরে প্রবেশ করিয়াই বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিল, ও কি ঠাকুরঝি! কাপড় পরনি যে? খবর পাওনি নাকি?

বিমলা সলজ্জ হাসিমুখে বলিল, পেয়েছি বৈ কি; কিন্তু একটু দেরী হবে ভাই। উনি এইমাত্র একটুখানি বেড়াতে বেরুলেন— ফিরে না এলে ত যেতে পার্‌ব না।

ইন্দু মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইল। একটা খোঁচা দিয়া প্রশ্ন করিল, প্রভুর হুকুম পাওনি বুঝি?

বিমলার সুন্দর মুখখানি স্নিগ্ধ মধুর হাসিতে ভরিয়া গেল। এই খোঁচাটুকু সে যেন ভারি উপভোগ করিল। কহিল, না,

দাসীর আর্জ্জি এখনও পেশ করা হয় নি, হ'লে যে না-মঞ্জুর হবে না, সে ভরসা করি।

ইন্দু আরও বিরক্ত হইল। প্রশ্ন করিল, তবে পেশ হয়নি কেন? খবর ত তোমাকে আমি বেলা থাকতেই পাঠিয়েছিলুম।

তখন সাহস হ'ল না বৌ। আফিস থেকে এসেই বললেন, মাথা ধরেছে। ভাবলুম, জলটল খেয়ে একটু ঘুরে আসুন, মনটা প্রফুল্ল হোক্—তখন জানাব। এখনও ত দেরী আছে, একটু ব'স না ভাই, তিনি ফিরে এলেন ব'লে।

কি জানি, কিসে তোমার হাসি আসে ঠাকুরঝি! আমি এমন হ'লে লজ্জায় মরে যেতুম। আচ্ছা, ঝিকে কিংবা বেহারাটাকে ব'লে কি যেতে পার না?

বিমলা সভয়ে বলিল, বাপ্‌রে! তা হ'লে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দেবেন—এ জন্মে আর মুখ দেখবেন না।

ইন্দু ক্রোধে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া কহিল, দূর ক'রে দেবেন! কোন্ আইনে? কোন্ অধিকারে শুনি?

বিমলা নিতান্ত সহজভাবে জবাব দিল বাধা কি বৌ! তিনি মালিক—আমি দাসী বৈ ত নয়। তিনি তাড়ালে কে তাঁকে ঠেকাবে বল?

ঠেকাবে রাজা। ঠেকাবে আইন। সে চুলোয় যাক্‌গে ঠাকুরঝি, কিন্তু নিজের মুখে নিজেকে দাসী ব'লে কবুল করতে কি একটু লজ্জা হয় না? স্বামী কি মোগল বাদশা? আর স্ত্রী কি তাঁর ক্রীতদাসী যে আপনাকে আপনি এমন হীন, এমন তুচ্ছ ক'রে গৌরব বোধ করচ?

এই ক্রোধটুকু লক্ষ্য করিয়া বিমলা আমোদ বোধ করিল, কহিল, তোমার ঠাকুরঝি যে মুখ্যু মেয়েমানুষ বৌ, তাই নিজেকে স্বামীর দাসী ব'লে গৌরব বোধ করে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি ভাই, তুমি যে এত কথা বল্‌চ, তুমিই কি বাড়ী থেকে বেরিয়েচ দাদার হুকুম না নিয়ে?

হুকুম? কেন, কি জন্যে? তিনি নিজে যখন কোথাও যান—আমার হুকুমের অপেক্ষা করেন কি? আমি যাচ্চি, শুধু এই কথা তাঁকে জানিয়ে এসেচি। নিমেষমাত্র মৌন থাকিয়া, অকস্মাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া কহিল, তবে এ কথা মানি যে, আমার মত গুণের স্বামী, কম মেয়েমানুষের ভাগ্যে জোটে। আমার কোন ইচ্ছাতেই তিনি বাধা দেন না; কিন্তু, এমনি যদি না-ও হ'ত, তিনি যদি নিতান্ত অবিবেচক হ'তেন, তা হ'লেও তোমাকে বল্‌চি ঠাকুরঝি, আমি নিজের সম্মান ষোল আনা বজায় রাখতে পার্‌তুম; কিছুতেই তোমাদের মত এ কথা ভুল্‌তে পার্‌তুম না যে, আমি সঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণী—তাঁর ক্রীতদাসী নই। জান ঠাকুরঝি, এমনি ক'রেই আমাদের দেশের সমস্ত মেয়েমানুষ পুরুষের পায়ে মাথা মুড়িয়ে এত তুচ্ছ, এমন খেলার পুতুল হ'য়ে দাঁড়িয়েচে। নিজের সম্ভ্রম নিজে না রাখলে, কেউ কি যেচে দেয় ঠাকুরঝি? কেউ না। আমার ত এমন স্বামী, তবু কখনও তাঁকে আমি এ কথা ভাববার অবকাশ দিইনি—তিনি প্রভু, আর আমি স্ত্রী ব'লেই তাঁর বাঁদী। আমার নারীদেহেও ভগবান বাস করেন, এ কথা আমি নিজেও ভুলিনে—তাঁকেও ভুল্‌তে দিইনে।

বিমলা চুপ করিয়া শুনিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল ; কিন্তু তাহাতে লজ্জা বা অনুশোচনা কিছুই প্রকাশ পাইল না। কহিল, জানিনে বৌ, আত্মসম্ভ্রম আদায় করা কি ; কিন্তু তাঁর পায়ে আত্ম-বিসর্জ্জন দেওয়াটা বুঝি। ঐ যে উনি এলেন ; একটু ব'স ভাই, আমি শীগ্‌গির হুকুম নিয়ে আসি, বলিয়া, হঠাৎ একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

ইন্দু এ হাসিটুকু দেখিতে পাইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ রাগে রি রি করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

* * * *

বায়স্কোপ হইতে ফিরিবার পথে ইন্দু হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ঠাকুরঝি, হুকুম না পেলে ত তুমি আসতে পার্‌তে না।

বিমলা পথের দিকে চাহিয়া, অন্যমনস্ক হইয়া কি জানি কি ভাবিতেছিল, বলিল, না।

তাই আমার মনে হয় ঠাকুরঝি আমি যখন তখন এসে তোমাকে ধ'রে নিয়ে যাই ব'লে, তোমার স্বামী হয় ত রাগ করেন।

বিমলা মুখ ফিরাইয়া কহিল, তা হ'লে আমি নিজেই বা যাব কেন বৌ! বরং আমার ভয় হয়, তুমি এমন ক'রে এসো ব'লে দাদা হয় ত মনে মনে আমার উপর বিরক্ত হন।

ইন্দু সগর্ব্বে কহিল, তোমার দাদার সে স্বভাব নয়। একে ত কখনো তিনি নিজের অধিকারের বাইরে পা দেন না, তা ছাড়া আমার কাজে রাগ করবেন, আমি ঠিক জানি, এ স্পর্দ্ধা তাঁর স্বপ্নেও আসে না।

বিমলা মিনিট-দুই স্থির থাকিয়া, গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, বৌ, দাদা তোমাকে কি ভালই না বাসেন! কিন্তু তুমি বোধ করি—

এতক্ষণে ইন্দুর মুখে হাসি ফুটিল। কহিল, তাঁর কথা অস্বীকার করি নে; কিন্তু আমার সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ হ'ল যেন—

তা জানিনে বৌ! কিন্তু মনে হ'ল কিসে?

কেন হয় জান ঠাকুরঝি, তোমাদের মত পায়ে লুটিয়ে-পড়া ভালবাসা আমার নেই ব'লে। আর ঈশ্বর করুন, আমার নারী-মর্য্যাদাকে ডিঙিয়ে যেন কোন দিন আমার ভালবাসা মাথা তুলে উঠতে না পারে। যে ভালবাসা আমার স্বাধীন-সত্তাকে লঙ্ঘন ক'রে যায়, সে ভালবাসাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি।

বিমলা গোপনে শিহরিয়া উঠিল।

মিনিট-খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া ইন্দু কহিল, কথা কও না যে ঠাকুরঝি! কি ভাব্‌চ?

কিছু না। প্রার্থনা করি দাদা তোমাকে চিরদিন এমনই ভালবাসুন, কারণ, যতই কেন বল না বৌ, মেয়েমানুষের স্বামীর ভালবাসার চেয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও বড় নয়। মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া বিমলা পুনরায় কহিল, কি জানি তোমার নারী-মর্য্যাদা—আর কি তোমার স্বাধীন-সত্তা। আমি ত আমার সমস্তই তাঁর পায়ে ডুবিয়ে দিয়ে বেঁচেচি। সত্যি বল্‌চি বৌ, আমার ত এম্‌নি দশা হয়েচে, নিজের ইচ্ছে ব'লেও যেন আর কিছু বাকি নেই। তাঁর ইচ্ছেই—

ছি ছি, চুপ কর—চুপ কর—

বিমলা চমকিয়া চুপ করিল। ইন্দু ঘৃণাভরে বলিতে লাগিল, আমাদের দেশের মেয়েরা কি মাটির পুতুল? প্রাণ নেই, আত্মা নেই—কিছু নেই! আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এত করে কি পেয়েচ? আমার চেয়ে বেশী ভালবাসা আদায় করতে পেরেচ কি? ঠাকুরঝি, ভালবাসা মাপবার যে যন্ত্র নেই, নইলে মেপে দেখাতে পারতুম—যাক্ সেকথা—কিন্তু কেন জান? নিজেকে তোমাদের মত নীচু করিনি ব'লে—তোমাদের এই কাঙাল বৃত্তি মাথায় তুলে নিইনি ব'লে। আমার ভারি দুঃখ হয় ঠাকুরঝি, কেন তিনি এত শান্ত, এত নিরীহ। কিছুতেই একটা কথা বলেন না—নইলে, দেখিয়ে দিতুম, তিনি যাকে গ্রাহ্য করেন না, সেও মানুষ; সেও অগ্রাহ্য করতে জানে। সেও আত্ম-মর্য্যাদা হারিয়ে ভালবাসা চায় না। ও আবার কি? মুখ ফিরিয়ে হাসচ যে!

বিমলা জোর করিয়া হাসি চাপিয়া বলিল, কৈ—না।

না কেন? এখনো ত তোমার ঠোঁটে হাসি লেগে রয়েচে।

বিমলা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, লেগে রয়েচে তোমার কথা শুনে। ওগো বৌ, অনেক পেয়েচ ব'লেই এত কথা বেরুচ্চে।

ইন্দু ক্রুদ্ধমুখে জিজ্ঞাসা করিল, না পেলে?

বেরুত না।

ভুল—নিছক ভুল। ঠাকুরঝি, সকলেই তোমার মত নয়—সকলেই ভিক্ষে চেয়ে বেড়ায় না। আত্মগৌরব বোঝে, এমন নারীও সংসারে আছে।

এবার বিমলার মুখের হাসি ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল; বলিল, তা জানি।

জান্‌লে আর বল্‌তে না। যাই হোক্, এখন থেকে জেনো, যে, ভিক্ষে চায় না, নিজের জোরে আদায় করে, এমন লোকও আছে।

বিমলা ব্যথিতস্বরে বলিল, আচ্ছা। এই যে বাড়ী এসে পড়েচি। একবার নাব্‌বে না কি?

নাঃ—আমিও বাড়ী যাই। ঐ ও গলিতে—

দাদাকে আমার প্রণাম দিয়ো বৌ।

দেবো—গাড়োয়ান চলো—

২

আর নেই—সংসার-খরচের কিছু টাকা দিতে হবে যে।

স্ত্রীর প্রার্থনায় নরেন্দ্র আশ্চর্য্য হইল। কহিল, এর মধ্যেই দুশ' টাকা ফুরিয়ে গেল?

না গেলে কি মিথ্যে কথা বল্‌চি; না, লুকিয়ে রেখে চাইচি?

নরেন্দ্রের চোখে একটা ভয়ের ছায়া পড়িল। কোথায় টাকা? কি করিয়া সংগ্রহ করিবে?

সেই মুখের ভাব ইন্দু দেখিল বটে, কিন্তু ভুল করিয়া দেখিল। কহিল, বিশ্বাস না হয়, এখন থেকে একটা খাতা দিও, হিসেব লিখে রাখব। কিংবা এক কাজ কর না—খরচের টাকাকড়ি নিজের হাতেই রেখ—তাতে তোমারও ভয় থাক্‌বে না, আমিও

সংশয়ের লজ্জা থেকে রেহাই পাব। বলিয়া তীব্র-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, তাঁহার মুখের গাঢ় ছায়া বেদনায় গাঢ়তর হইয়াছে।

নরেন্দ্র ধীরে ধীরে বলিল, অবিশ্বাস করিনি, কিন্তু—

কিন্তু কি? বিশ্বাসও হয় না—এই ত? আচ্ছা যাচ্ছি, যতটা পারি হিসেব লিখে আনি। উঃ—কি সুখের ঘর-কন্নাই হয়েছে আমার! বলিয়া সক্রোধে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, কিন্তু কেন? কিসের জন্য হিসেব লিখ্‌তে যাব—আমি কি মিথ্যে বলি? আমার মামাত বোনের বিয়েতে কাপড় জামা লাগল—পঞ্চাশ টাকার ওপর। কমলার জামা দুটোর দাম বার টাকা—সেদিন বায়স্কোপে খরচ হ'ল দশ টাকা—খতিয়ে দেখ দেখি, বাকি থাকে কত? তাতে এই দশ-পনর দিন সংসার-খরচটা কি এমনি বেশী যে তোমার দুচোখ কপালে উঠছে! আমার দাদার সংসারে মাসে সাত-আটশ টাকাতেও যে হয় না! সত্য বল্‌চি, এমন করলে ত আমি আর ঘরে টিক্‌তে পারি নে। তার চেয়ে বরং স্পষ্ট বল; দাদা মেদিনীপুরে বদ্‌লি হয়েছেন, আমি মেয়ে নিয়ে চ'লে যাই—আমিও জুড়োই, তুমিও বাঁচ!

নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিয়া, মুখ তুলিয়া কহিল, এ-বেলায় ত হবে না, দেখি যদি ও-বেলায় কিছু যোগাড় কর্‌তে পারি।

তার মানে? যদি যোগাড় না কর্‌তে পার, উপোস করতে হবে নাকি? দেখ, কালই আমি মেদিনীপুরে যাব; কিন্তু, তুমিও এক কাজ কর। এই দালালী ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে, দাদাকে ধরে

একটা চাকরি জোগাড় ক'রে নাও, তাতে বরঞ্চ ভবিষ্যতে থাকবে ভাল ; কিন্তু যা পার না, তাতে হাত দিয়ে নিজেও মাটি হ'য়ো না, আমাকেও নষ্ট ক'রো না।

নরেন্দ্র জবাব দিল না। ইন্দু আরও কি বলিতে যাইতে-ছিল, কিন্তু এই সময় বেহারাটা শম্ভুবাবুর আগমন সংবাদ জানাইল, এবং পরক্ষণেই বাহিরে জুতার পদশব্দ শোনা গেল। ইন্দু পার্শ্বের দ্বার দিয়া, পর্দ্দার আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইল।

শম্ভুবাবু মহাজন। নরেন্দ্রের পিতা বিস্তর ঋণ করিয়া স্বর্গীয় হইয়াছেন। পুত্রের কাছে তাগাদা করিতে শম্ভুনাথ প্রায়ই শুভাগমন করিয়া থাকেন। আজিও উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি মৃদুভাষী। আসন গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে এমন গুটি-কয়েক কথা বলিলেন, যাহা দ্বিতীয়বার শুনিবার পূর্ব্বে অতি-বড় নির্লজ্জও নিজের মাথাটা বিক্রয় করিয়া ফেলিতে দ্বিধা করিবে না। শম্ভুবাবু প্রস্থান করিলে, ইন্দু আর একবার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে?

শম্ভুবাবু।

তার পরে?

কিছু টাকা পাবেন, চাইতে এসেছিলেন।

সে টের পেয়েছি ; কিন্তু, ধার করেছিলে কেন?

নরেন্দ্র এ প্রশ্নের জবাবটা একটু ঘুরাইয়া দিল। কহিল, বাবা হঠাৎ মারা গেলেন, তাই—

ইন্দু অতিশয় রুক্ষস্বরে বলিল, তোমার বাবা কি পৃথিবীশুদ্ধ

লোকের কাছে দেনা ক'রে গেছেন ? এ শোধ করবে কে ? তুমি ? কি ক'রে করবে শুনি ?

এতগুলো প্রশ্নের এক নিশ্বাসে জবাব দেওয়া যায় না। ইন্দু নিজেও সে জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল না—তৎক্ষণাৎ কহিল, বেশ ত, তোমার বাবা না হয় হঠাৎ মারা গেছেন, কিন্তু তুমি ত হঠাৎ বিয়ে করনি; বাবাকে এ সব ব্যাপার তোমার ত জানান উচিত ছিল। আমাকে গোপন করাও ত কর্ত্তব্য হয়নি। লোকের মুখে শুনি, তুমি ভারী ধর্ম্মভীরু লোক—বলি এ সব বুঝি তোমার ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখে না ? বলিয়া ঠিক যেন সে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু হায় রে, এতগুলা সুতীক্ষ্ণ বাণ যাহার উপর এমন নিষ্ঠুরভাবে বর্ষিত হইল, ভগবান তাহাকে কি নিরস্ত্র, কি নিরুপায় করিয়াই সংসারে পাঠাইয়াছিলেন ! কাহাকেও কোনও কারণেই প্রতিঘাত করিবার সাধ্যটুকুও তাহার ছিল না ; শুধু সাধ্য ছিল সহ্য করিবার। আঘাতের সমস্ত বেদনাই তাহার নিজের মধ্যে পাক খাইয়া, অত্যল্প সময়ের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া যাইত ; কিন্তু সেই স্বল্প সময়টুকু আজ তাহার মিলিল না। শম্ভুবাবুর অত্যুগ্র কথার জ্বালা, কণামাত্র শান্ত হইবার পূর্ব্বেই ইন্দু তাহাতে এমন ভীষণ তীব্র জ্বালা সংযোগ করিয়া দিল যে, তাহারই অসহ্য দহনে আজ সেও প্রত্যুত্তরে একটা কঠোর কথাই বলিতে উদ্যত হইয়া উঠিল ; কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিল না। অক্ষমের নিষ্ফল আড়ম্বর মাথা তুলিয়াই ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।

শুধু ক্ষীণস্বরে বলিল, বাবার সম্বন্ধে তোমার কি এমন ক'রে বলা উচিত ?

—না, উচিত নয়—কিন্তু আমার উচিত-অনুচিতের কথা তোমাকে মীমাংসা ক'রে দিতে ত বলি নি। কেন তোমাদের সমস্ত ব্যাপার বাবাকে খুলে বলনি ?

আমি কিছুই গোপন করিনি ইন্দু। তা ছাড়া, তিনি বাবার বাল্যবন্ধু ছিলেন, নিজেই সমস্ত জানতেন।

তা হ'লে বল সমস্ত জেনে-শুনেই বাবা আমাকে জলে ফেলে দিয়েছেন !

অসহ্য ব্যথায় ও বিস্ময়ে নরেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া থাকিয়া শির নত করিল। স্ত্রীর এই ক্রোধ যথার্থ-ই সত্য কিংবা কলহের ছলনা মাত্র, হঠাৎ সে যেন ঠাহর করিতে পারিল না।

এখানে গোড়ার কথা একটু বলা আবশ্যক। একসময়ে বহুকাল উভয় পরিবার পাশাপাশি বাস করিয়াছিলেন এবং বিবাহটা সেই সময়েই একরূপ স্থির হইয়াছিল ; কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে ইন্দুর পিতা নিজের মত-পরিবর্ত্তন করিয়া, মেয়েকে একটু অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইতে মনস্থ করায়, বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায় ! কয়েক বর্ষ পরে ইন্দুর আঠারো বৎসর বয়সে আবার যখন কথা উঠে, তখন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া শুনেন, নরেন্দ্রের পিতার মৃত্যু হইয়াছে। সে সময় তাহার সাংসারিক অবস্থা ইন্দুর পিতামাতা যথেষ্ট পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন ; এমনকি, তাঁহার মত পর্য্যন্ত

ছিল না ; শুধু বয়স্থা শিক্ষিতা কন্যার প্রবল অনুরাগ উপেক্ষা করিতে না পারিয়াই অবশেষে তাঁহারা সম্মত হইয়াছিলেন।

এত কথা এত শীঘ্র ইন্দু যথার্থ-ই ভুলিয়াছে কিংবা মিথ্যা মোহে অন্ধ হইয়া, নিজেকে প্রতারিত করিবার নিদারুণ আত্মগ্লানি এখন এমন করিয়া তাহাকে অহরহ জ্বালাইয়া তুলিতেছে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নরেন্দ্র স্তব্ধ নিরুত্তরে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

সেই নির্ব্বাক স্বামীর আনত মুখের প্রতি ক্ষণকাল দৃষ্টিপাত করিয়া, ইন্দু আর কোন কথা না বলিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সে নিঃশব্দে গেল বটে—এমন অনেকদিন গিয়াছে ; কিন্তু আজ অকস্মাৎ নরেন্দ্রের মনে হইল, তাহার বুকের বড় বেদনার স্থানটা ইন্দু যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক জোর করিয়া মাড়াইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল। একবার ঈষৎ একটু ঘাড় তুলিয়া স্ত্রীর নিষ্ঠুর পদক্ষেপ চাহিয়া দেখিল ; যখন আর দেখা গেল না, তখন গভীর—অতি গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নির্জীবের মত সেইখানেই এলাইয়া শুইয়া পড়িল। সহসা আজ প্রথমে মনে উদয় হইল, সমস্ত মিথ্যা—সব ফাঁকি। এই সংসার, স্ত্রী-কন্যা, স্নেহ-প্রেম—সমস্তই আজ তাহার কাছে এক নিমেষে মরুভূমির মরীচিকার মত উবিয়া গেল।

৩

দাদা !

কে রে, বিমল ? আয় বোন বোস্ ! বলিয়া নরেন্দ্র শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। তাহার উভয় ওষ্ঠপ্রান্তে ব্যথার যে চিহ্নটুকু প্রকাশ পাইল, তাহা বিমলার দৃষ্টি এড়াইল না।

অনেক দিন দেখিনি দিদি, ভাল আছিস্ ত ?

বিমলার চোখ দুটি ছল ছল করিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে শয্যাপ্রান্তে আসিয়া বলিল, কেন দাদা, তোমার অসুখের কথা আমাকে এতদিন জানাওনি ?

অসুখ তেমন ত কিছুই ছিল না বোন, শুধু সেই বুকের ব্যথাটা একটু—

বিমলা হাত দিয়া এক ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, একটু বৈ কি ! উঠে বস্‌তে পার না—ডাক্তার কি বল্‌লে ?

ডাক্তার ? ডাক্তার কি হবে রে, ও আপনি সেরে যাবে।

এঁ্যা ! ডাক্তার পর্য্যন্ত ডাকাওনি ? ক'দিন হ'ল ?

নরেন্দ্র একটুখানি হাসিয়া বলিল, ক'দিন ? এই ত সেদিন রে ! দিন-সাতেক হবে বোধ হয়।

সাত দিন ! তা হ'লে বৌ সমস্ত দেখেই গেছে !

না না, দেখে যায়নি বোধ হয়—অসুখ আমার নিশ্চয় সে বুঝতে পারেনি। আমি তার যাবার দিনও উঠে গিয়ে বাইরে ব'সে ছিলুম। না না, হাজার রাগ হোক, তাই কি তোরা পারিস্ বোন ?

বৌ তা হ'লে রাগ ক'রে গেছে বল ?

না, রাগ নয়, দুঃখ-কষ্ট—কত অভাব জানিস্ ত ? ওদের এ সব সহ্য করা অভ্যাস নেই, দেহটাও তার বড় খারাপ হয়েচে, নইলে অসুখ দেখ্‌লে কি তোরা রাগ ক'রে থাক্‌তে পারিস্ ?

বিমলা অশ্রু চাপিয়া, কঠিনস্বরে বলিল, পারি বৈকি দাদা, আমাদের অসাধ্য কাজ কিছুই নেই, না হ'লে তোমরা বিছানায় না শোয়া পর্য্যন্ত আর আমাদের চোখে পড়ে না !—ভোলা, পাল্‌কি এল রে ?

আনতে পাঠিয়েছি মা !

এর মধ্যে যাবি দিদি ? এখনো ত সন্ধ্যে হয়নি, আর একটু বোস্ না।

না দাদা, সন্ধ্যে হ'লে হিম লাগবে। ভোলা, পাল্‌কি একেবারে ভেতরে আনিস্।

ভেতরে কেন বিমল ?

ভেতরেই ভাল দাদা। এই ব্যথা নিয়ে তোমার বাইরে গিয়ে উঠতে কষ্ট হবে।

আমাকে নিয়ে যাবি ? এই পাগল দেখ ! কি হয়েচে যে এত কাণ্ড করতে হবে ? এ ত আমার প্রায়ই হয় ? প্রায়ই সেরে যায়।

তাই যাক্ দাদা। কিন্তু ভাই ত আমার আর নেই যে, তোমাকে হারালে আর একটি পাব। ঐ যে পাল্‌কি—এই র‍্যাপারখানা বেশ ক'রে গায়ে জড়িয়ে নিয়ো।—ভোলা, আর একটু এগিয়ে আন্‌তে বল্। না দাদা, এ সময় তোমাকে

চোখে-চোখে না রাখতে পার্‌লে আমার তিলার্দ্ধ স্বস্তি থাক্‌বে না।

কিন্তু, নিয়ে যেতে চাইবি বুঝ্‌লে যে তোকে আমি খবরই দিতুম না।

বিমল মুখ পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তোমাদের বোঝা তোমাদেরই থাক দাদা, আমাকে আর শুনিয়ো না। আচ্ছা কি ক'রে মুখে আন্‌লে বল ত? এই অবস্থায় তোমাকে একলা ফেলে রেখে যেতে পারি? সত্যি কথা ব'ল।

নরেন্দ্র একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তবে চল্‌ যাই।

দাদা?

কি রে?

আজ রাত্রেই বৌকে একখানা টেলিগ্রাম ক'রে দিই, কাল সকালেই চ'লে আসুক।

নরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া উঠিল—না, না, সে দরকার নেই।

কেন নেই? মেদিনীপুর ত বেশী দূর নয়, একবার আসুক, না হয় আবার চ'লে যাবে।

না রে বিমল, না। সত্যিই তার দেহ ভাল নেই—দুদিন জুড়োক।

একটুখানি থামিয়া বলিল, বিমল, আমি তোর কাছে থেকে ভাল না হ'তে পারি 'ত আর কিছুতেই পারব না। হাঁ রে, আমি যে যাচ্চি, গগনবাবু শুনেচেন?

বেশ যা হোক্‌ তুমি! তিনি ত এখনো আফিস থেকেই ফেরেননি।

তবে ?

তবে আবার কি ? তোমার ভয় নেই দাদা, তাঁর বেশ বড় বড় দুটো চোখ আছে, আমরা গেলেই দেখ্‌তে পাবেন।

নরেন্দ্র বিছানায় শুইয়া পড়িয়া কহিল, বিমল, আমার যাওয়া ত হ'তে পারে না।

বিমলা অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন ?

গগনবাবুর অমতে—

অমন কর্‌লে মাথা খুঁড়ে মরব দাদা ! একটা বাড়ীর মধ্যে কি ভিন্ন ভিন্ন মত থাকে যে, আমাকে অপমান কর্‌চ ?

অপমান কর্‌চি ! ঠিক জানিস্ বিমল, ভিন্ন মত থাকে না ?

বিমল আবশ্যক বস্ত্রাদি গুছাইয়া লইতেছিল, সলজ্জে মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

* * * *

দাদা, আজ ব্যথাটা তত টের পাচ্চনা, না ?

একেবারে না। এ আট দিন তোদের কি কষ্টই না দিলুম—এখন বিদেয় কর্ দিদি।

কর্‌ব কার কাছে ? আচ্ছা দাদা, এই ষোল-সতর দিনের মধ্যে বৌ একখানা চিঠি পর্য্যন্ত দিলে না ?

না, দিয়েচেন বৈ কি ! পৌঁছান সংবাদ দিয়েছিলেন, কালও একখানা পেয়েচি—বরং আমিই জবাব দিতে পারিনি ভাই।

বিমলা মুখ ভার করিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্র লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিল, সেখানে গিয়ে পর্য্যন্ত সে

ভাল নেই—সর্দ্দি-কাসি,—পরশু একটু জ্বরের মত হয়েছিল, তবু তার ওপরেই চিঠি লিখেছেন।

আজ তাই বুঝি সেখানে টাকা পাঠিয়ে দিলে ?

নরেন্দ্র অধিকতর লজ্জিত হইয়া পড়িল। কহিল, কিছুই ত তার হাতে ছিল না—বাড়ীর পাশেই একটা মেলা বস্‌চে লিখেচেন, সেটা শেষ হ'য়ে গেলেই ফির্‌তে পারবেন—তোমাকে বুঝি চিঠিপত্র লিখতে পারেন নি ?

পেরেছেন বৈ কি। কাল আমিও একখানা চারপাতা জোড়া চিঠি পেয়েছি—

পেয়েছিস ? পাবি বৈ কি—তার জবাবটা—

তোমার ভয় নেই দাদা—তোমার অসুখের কথা লিখব না। আমার নষ্ট করবার মত অত সময় নেই। বলিয়া বিমলা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে খোলা জানালার ভিতর দিয়া ম্লান আকাশের পানে চাহিয়া নরেন্দ্র স্তব্ধভাবে বসিয়াছিল, বিমলা ঘরে ঢুকিয়া কহিল, চুপ ক'রে কি ভাবচ দাদা ?

নরেন্দ্র মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, কিছুই ভাবিনি বোন, মনে মনে তোকে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছিলুম, যেন এমনি সুখেই তোর চিরদিন কাটে।

বিমলা কাছে আসিয়া, তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া একটা চৌকির উপর বসিল।

আচ্ছা, দুপুর-বেলা অত রাগ ক'রে চ'লে গেলি কেন বল ত ?

আমি অন্যায় সইতে পারিনে। কেন তুমি অত—

অত কি বল্‌? ইন্দুর দিক থেকে একবার চেয়ে দেখ্‌ দেখি? আমি ত তাকে সুখে রাখতে পারিনি?

সুখে থাক্‌তে পারার ক্ষমতা থাকা চাই দাদা। সে যা পেয়েছে, এত ক'জন পায়? কিন্তু সৌভাগ্যকে মাথায় তুলে নিতে হয়; নইলে—কথাটা শেষ করিবার পূর্ব্বেই বিমলা লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।

নরেন্দ্র নীরবে স্নিগ্ধ-সস্নেহ দৃষ্টিতে এই ভগিনীটির সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিয়া, ক্ষণকাল পরে কহিল, বিমলা লজ্জা করিস্‌নে দিদি, সত্য বল্‌ ত, তুই কখনো ঝগ্‌ড়া করিস্‌নে?

উনি বলেচেন বুঝি? তা ত বল্‌বেনই।

নরেন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিল, না, গগনবাবু কিছুই বলেন নি—আমি তোকেই জিজ্ঞাসা করচি।

বিমলা আরক্ত মুখ তুলিয়া বলিল, তোমাদের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ক'রে কে পার্‌বে বল? শেষে হাতে-পায়ে প'ড়ে—ওখানে দাঁড়িয়ে কে?

আমি, আমি—গগনবাবু। থাম্‌লে কেন—ব'লে যাও! ঝগ্‌ড়া ক'রে কার হাতে-পায়ে কাকে পড়তে হয়—কথাটা শেষ ক'রে ফেল।

যাও—যে সাধু-পুরুষ লুকিয়ে শোনে, তার কথার আমি জবাব দিইনে। বলিয়া, বিমলা কৃত্রিম ক্রোধের আড়ালে হাসি চাপিয়া, দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

নরেন্দ্র সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মোটা তাকিয়াটায় হেলান দিয়া বসিল। গগনবাবু বলিলেন, এ বেলায় কেমন আছ হে?

ভাল হ'য়ে গেছি। এইবার বিদায় দাও ভাই!

বিদায় দাও? ব্যস্ত হোয়ো না হে—দুদিন থাক। তোমার এই বোনটির আশ্রয়ে যে যে-ক'টা দিন বাস করতে পার, তার তত বৎসর পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, সে খবর জানো?

জানিনে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

গগনবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, বিশ্বাস করি কি হে, এ যে প্রমাণ করা কথা। বাস্তবিক নরেনবাবু, এমন রত্নও সংসারে পাওয়া যায়! ভাগ্য! ভাগ্যং ফলতি—কি হে কথাটা? নইলে আমার মত হতভাগ্য যে এ বস্তু পায়, এ ত স্বপ্নের অগোচর! বৌঠাকরুণ—না হে না, থেকে যাও দুদিন—এমন সংসার ছেড়ে স্বর্গে গিয়েও আরাম পাবে না, তা ব'লে দিচ্চি ভাই।

বিমলা বহু দূরে যায় নাই, ঠিক পর্দ্দার আড়ালেই কান পাতিয়াছিল—চোখ মুছিয়া উঁকি মারিয়া, সেই প্রায়ান্ধকারেও স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহার স্বামীর কথাগুলো শুনিয়া নরেন-দার মুখখানা একবার জ্বলিয়া উঠিয়াই যেন ছাই হইয়া গেল।

৪

দিন-পনর পরে দুপুরের গাড়ীতে ইন্দু মেয়ে লইয়া মেদিনীপুর হইতে ফিরিয়া আসিল। স্ত্রী ও কন্যাকে সুস্থ সবল দেখিয়া নরেন্দ্রের শীর্ণপাণ্ডুর মুখ মুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সাগ্রহে

ঘুমন্ত কন্যাকে বুকে টানিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, কেমন আছ ইন্দু ?

বেশ আছি। কেন ?

তোমার জ্বরের মতন হয়েছিল শুনে ভারি ভাবনা হয়েছিল। সেরে গেছে ?

না হ'লে ডাক্তার ডাকবে না কি ?

নরেন্দ্রের হাসি-মুখ মলিন হইল। কহিল, না, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌চি।

কি হবে ক'রে ? এদিকে ত পঞ্চাশটি টাকা পাঠিয়ে চিঠির ওপর চিঠি যাচ্ছিল—কেমন আছ—কেমন আছ—সাবধানে থেকো—সাবধানে থেকো। আমি কি কচিখুকি, না, পঞ্চাশটি টাকা দাদা আমাকে দিতে পার্‌তেন না ? ও টাকা পাঠিয়ে সকলের কাছে আমার মাথা হেঁট ক'রে দেবার কি দরকার ছিল ? সেদিন বাড়ীতে যেন একটা হাসি প'ড়ে গেল।

নরেন্দ্র ম্লানমুখ আরও ম্লান করিয়া, অস্ফুটে কহিল, আর যোগাড় কর্‌তে পারলুম না।

না পাঠিয়ে, তাই কেন লিখে দিলে না ? উঃ—আবার সেই নিত্য নেই নেই—দাও দাও—বেশ ছিলুম এতদিন। বাস্তবিক বড়লোকের মেয়ে গরীবের ঘরে পড়ার মত মহাপাপ আর সংসারে নেই, বলিয়া এই পরম সত্যে স্বামীর হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিয়া ইন্দু অন্যত্র চলিয়া গেল।

মাসাধিক পরে স্বামি-স্ত্রীর এই প্রথম সাক্ষাৎ !

বাহিরে আসিয়া ইন্দু ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, নিজের

শোবার ঘরে ঢুকিয়া ভারি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, বাড়ীর অন্যান্য স্থানের মত এখানেও সমস্ত বস্তু রীতিমত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হইতেছে।

জিজ্ঞাসা করিল, এত ঝাড়া-মোছা হচ্ছে কেন রে?

নূতন ঝি বলিল, আপনি আসবেন ব'লে।

আমি আসব ব'লে?

হাঁ মা, বাবু তাই ত ব'লে দিলেন। আপনি ময়লা কিছু দেখ্তে পারেন না—আজ তিন দিন থেকে তাই—

ইন্দু অন্তরের মধ্যে একটা বড় রকমের গর্ব্ব অনুভব করিল; কিন্তু সহজভাবে বলিল, ময়লা কে দেখতে পারে? তবু ভাল যে—

হাঁ মা, লোক লাগিয়ে ওপর নীচে সমস্ত সাফ করা হয়েচে।

ঝি, রামটহলটাকে একবার ডেকে দাও ত, বাজার থেকে কিছু ফল-মূল কিনে আনুক।

ফলটল ত সব আছে মা! বাবু আজ সকালে নিজে বাজারে গিয়ে সমস্ত খুঁটিয়ে কিনে এনেছেন।

ডাব আছে? আঙুর—

আছে বৈ কি। এখনি নিয়ে আস্‌চি, বলিয়া দাসী চলিয়া গেল। ইন্দুর মুখের উপর হইতে বিরক্তির মেঘখানা সম্পূর্ণ উড়িয়া গেল। বরং অনতিপূর্ব্বের স্বামীর মলিন মুখখানা বুকের কোথায় যেন একটু খচ্‌ খচ্‌ করিতে লাগিল।

বিশ্রাম করিয়া ঘণ্টা-দুই পরে সে প্রসন্নমুখে স্বামীর বসিবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, নরেন্দ্র চশমা খুলিয়া, খুব ঝুঁকিয়া

বসিয়া কি লিখিতেছে। কহিল, অত মন দিয়ে কি লেখা হচ্ছে? কবিতা?

নরেন্দ্র মুখ তুলিয়া বলিল, না।

কি তবে?

ও কিছু না, বলিয়া সে লেখাগুলো চাপা দিয়া রাখিল।

ইন্দুর প্রসন্ন মুখ মেঘাবৃত হইয়া উঠিল। কহিল, তা হ'লে 'কিছু-না'র উপর অত ঝুঁকে না পড়ে বরং যাতে দুঃখ-কষ্ট ঘোচে, এমন কিছুতেই মন দাও। শুনলুম দাদার হাতে নাকি গোটাকতক চাক্‌রী খালি আছে। বলিয়া ভাল করিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে নিশ্চয় জানিত, এই চাক্‌রি করার কথাটা তাহাকে চিরদিন আঘাত করে। আজ কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, আঘাতের কোন বেদনাই তাহার মুখে প্রকাশ পাইল না।

নরেন্দ্র শান্তভাবে বলিল, চাক্‌রী করবার লোকও সেখানে আছে।

এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত উত্তরে ইন্দু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া থাকিয়া বলিল, তা জানি; কিন্তু সেখানে আছে, এখানে নেই নাকি? আজকাল ভাল কথা বললে যে তোমার মন্দ হয় দেখ্‌চি! ঘরের কোণে ঘাড় গুঁজে ব'সে কবিতা লিখতে তোমার লজ্জা করে না? বলিয়া সে চোখ-মুখ রাঙা করিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ!

*　　*　　*　　*

অ্যাঁ—এ যে বৌ ! কখন এলে ?

পরশু দুপুর-বেলা ।

পরশু—দুপুর-বেলা ! তাই এত তাড়াতাড়ি আজ সন্ধ্যা-বেলায় দেখা দিতে এসেচ ? না ভাই বৌ, টানটা একটু কম ক'র ।

ইন্দু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, চিঠি লিখে জবাব পর্য্যন্ত পাইনে । আমি একা আর কত টান্‌ব ঠাকুরঝি ?

বিমলা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, জবাব পাওনি ?

সে না পাওয়াই । চার পাতার জবাব চার ছত্র ত ?

বিমলা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, তখন এতটুকু সময় ছিল না ভাই । এ ঘরে দাদা যদি বা একটু সার্‌লেন, ওদিকে আবার নতুন ভাড়াটে যায় যায় ।

ইন্দু কথাটার একবর্ণও বুঝিল না, হাঁ করিয়া রহিল ।

বিমলা সেদিকে মনোযোগ না করিয়া বলিতে লাগিল, সেই মঙ্গলবারটা আমার চিরকাল মনে থাকবে । সাত দিনের দিন খবর পেয়ে দাদাকে নিয়ে এলুম, তার দুদিন পরে দাদার বুকের ব্যথার যেমন বাড়াবাড়ি, অম্বিকাবাবুর অসুখটাও তেম্‌নি বেড়ে উঠল—তোমাকে বল্‌ব কি বৌ, সেক দিতে দিতে আর ফোমেণ্ট কর্‌তে কর্‌তে বাড়ীশুদ্ধ লোকের হাতের চামড়া উঠে গেল—সারা দিন-রাত কারু নাওয়া-খাওয়া পর্য্যন্ত হ'ল না । হাঁ, সতী-সাধ্বী বলি, ওই অম্বিকাবাবুর স্ত্রীকে । ছেলেমানুষ বৌ, কিন্তু কি যত্ন, কি স্বামী-সেবা ! তার পুণ্যেই এ যাত্রা তিনি রক্ষে পেয়ে গেলেন—নইলে ডাক্তার-বদ্যির সাধ্য ছিল না ।

অম্বিকাবাবু কে?

কি জানি, ঘাটালের কাছে কোথায় বাড়ী। চিকিৎসার জন্যে এখানে এসে আমাদের ঐ পাশের বাড়ীটা ভাড়া নিয়েচেন। লোকজন নেই—পয়সা-কড়িও নেই—শুধু বৌটি—

ইন্দু মাঝখানেই প্রশ্ন করিল, তোমার দাদার বুঝি খুব বেড়েছিল?

বিমলা ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিয়া কহিল, সে রাতে আমার ত সত্যিই ভয় হয়েছিল। ঐ তাকের ওপর ওষুধের খালি শিশি-গুলো চেয়ে দেখ না—তিন জন ডাক্তার—আর,—আচ্ছা বৌ, দাদা বুঝি এ সব কথা তোমাকে চিঠিতে লেখেননি?

ইন্দু অন্যমনস্কের মত কহিল, না।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, এখানে এসে বুঝি শুনলে?

ইন্দু তেমনিভাবে জবাব দিল, হাঁ।

বিমলা বলিতে লাগিল, আমি ত তোমাকে প্রথমদিনেই টেলিগ্রাম করতে চেয়েছিলুম; মাত্র দুই-তিন ঘণ্টার পথ স্বচ্ছন্দে আস্‌তে পার্‌তে, কিন্তু দাদা কিছুতেই দিলেন না। হাসিয়া কহিল, কি যে তাঁকে তুমি করেচ, তা তুমিই জান বৌ, পাছে অসুখ শরীরে তুমি ব্যস্ত হও, এই ভয়ে কোন মতেই খবর দিতে চাইলেন না। যাক্—ঈশ্বরেচ্ছায় ভাল হ'য়ে গেছে—নইলে—

নইলে আর কি হ'ত ঠাকুরঝি? অসুখ সারতেও আমাকে দরকার হয় নি, না সার্‌লেও হয়ত দরকার হ'ত না। বলিয়া ইন্দু উঠিয়া গিয়া, ঔষধের শূন্য এবং অর্দ্ধশূন্য শিশিগুলা নাড়িয়া চাড়িয়া লেবেলের লেখা পড়িয়া দেখিতে লাগিল।

কিন্তু এ কি হইল? কখনও যাহা হয় নাই—আজ অকস্মাৎ তাহার দুই চোখ অশ্রুতে ঝাপ্সা হইয়া গেল। কেন, সে কি কেহ নয় যে, এতবড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল অথচ তাহাকে জানানো পর্য্যন্ত হইল না! সে নিজের এমন কি পীড়ার কথা লিখিয়াছিল, যাহাতে সংবাদ দেওয়াটাও কেহ উচিত মনে করিলেন না!

তিনি ভাল হইয়াও ত কতকগুলা পত্রে কত কথা লিখিলেন, শুধু নিজের কথাটাই বলিতে ভুলিলেন? বেশ, এখানে আসিয়াও ত তিন দিন হইল, তবু কি মনে পড়িল না?

ইন্দুর তীব্র অভিমানের সুর বিমলা টের পাইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, শিশি-বোতল নাড়াচাড়া ক'রে আর কি হবে বৌ, ওরা কখনও মিথ্যে সাক্ষী দেবে না, তা যতই জোর কর না। এস, তোমার চা দেওয়া হয়েছে।

চল, বলিয়া ইন্দু অলক্ষ্যে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

চা খাওয়া শেষ হইলে, বিমলা কি জানি ইচ্ছা করিয়া আঘাত দিল কি না—কহিল, সে এক হাসির কথা বৌ। এক বাড়ীতে দুই রোগী, কিন্তু দুজনের কি আশ্চর্য্য ভিন্ন ব্যবস্থা! দাদা মর মর হ'য়েও তোমাকে খবর দিতে দিলেন না, পাছে ব্যস্ত হও—পাছে তোমার শরীর খারাপ হয়—আর অম্বিকাবাবু একদণ্ডও ওঁর স্ত্রীকে সুমুখ থেকে নড়তে দিলেন না। তাঁর ভয়, সে চোখের সুমুখ থেকে গেলেই তাঁর প্রাণটা বেরিয়ে যাবে! এমন কি, সে ছাড়া তিনি কারও হাতে বিশ্বাস ক'রে ওষুধ

খেতেন না—এমন কখনও শুনেচ বৌ? আমাদের এঁকে তোমরা সবাই তামাসা কর, কিন্তু অম্বিকাবাবুরা সকলকে ডিঙিয়ে গেছেন; খেটে খেটে এই মেয়েটির ঠিক মড়ার মত আকৃতি হয়েছে।

হুঁ, বলিয়া ইন্দু উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আর একদিন এসে তোমার সতী-সাধ্বী বৌটির সঙ্গে আলাপ করে যাব—আজ গাড়ী এসেছে, চল্‌লুম।

তা হ'লে কাল একবার এস। আলাপ ক'রে বাস্তবিক খুশী হবে।

দেখা যাবে যদি কিছু শিখতে পারি, বলিয়া ইন্দু মুখ ভার করিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল। অম্বিকাবাবুর পাগলামি তাহার মনের মধ্যে আজ সমস্ত পথটা তাহার স্বামীর গভীর মঙ্গলেচ্ছার গায়ে ধূলা ছিটাইয়া লজ্জা দিতে দিতে চলিল।

৫

দিন-দুই পরে কথায় কথায় ইন্দু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, যদি সত্যি কথা শুনলে রাগ না কর, তা হ'লে বলি ঠাকুরঝি, বিয়ে করা তোমার দাদারও উচিত হয়নি, এই অম্বিকাবাবুরও হয়নি।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

কারণ প্রতিপালন করবার ক্ষমতা না থাকলে, এটা মহাপাপ।

উত্তর শুনিয়া বিমলা মর্ম্মাহত হইল। ইন্দুকে সে ভালবাসিত। খানিক পরে কহিল, অম্বিকাবাবুরও অন্যায় হ'য়ে থাকতে পারে, কিন্তু তাই ব'লে তাঁর স্ত্রী নিজের কর্ত্তব্য কর্‌বে না? তাকে ত মরণ পর্য্যন্ত স্বামী-সেবা কর্‌তে হবে?

কেন হবে? তিনি অন্যায় কর্‌বেন, যাতে অধিকার নেই, তাই কর্‌বেন—তার ফলভোগ কর্‌ব আমরা? তুমি ইংরিজি পড়নি, আর পাঁচটা সভ্যসমাজের খবর রাখ না; নইলে বুঝিয়ে দিতে পারতুম, কর্ত্তব্য শুধু একদিকে থাকে না। হয় দু'দিকে থাক্‌বে, না হয় থাক্‌বে না। পুরুষেরা এ কথা আমাদের বুঝতে দেয় না; দেয় না বলেই আমরা অম্বিকাবাবুর স্ত্রীর মত মৃত্যুপণ ক'রে সেবা করি।

বিমলা মুহূর্ত্ত কাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, না হ'লে করতাম না! বৌ, সেবা করাটা কি স্ত্রীর বড় দুঃখের কাজ ব'লে মনে কর? অম্বিকাবাবুর স্ত্রীর বাইরের ক্লেশটাই দেখতে পাও, তার ভেতরের আনন্দটা জান্‌তে পাও কি?

আমি জান্‌তেও চাইনে।

স্বামীর ভালবাসাটাও বোধ করি জান্‌তে চাও না!

না ঠাকুরঝি, অরুচি হয়ে গেছে; বরং, ওটা কম ক'রে নিজের কর্ত্তব্যটা করলেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

বিমলা দাঁড়াইয়া ছিল, নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া বলিল, ঠিক এই কথাটা আগেও একবার বলেচ। কিন্তু তখনও বুঝতে পারি নি, এখনও বুঝতে পারলুম না; আমার দাদা তাঁর কর্ত্তব্য করেন না! কি সে, তা তুমিই জান! অনেক

বই পড়েচ, অনেক দেশের খবর জান—তোমার সঙ্গে তর্ক করা সাজে না! কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, স্বামী ন্যায়-অন্যায় যাই করুন, তাঁর ভালবাসা অগ্রাহ্য করবার স্পর্দ্ধা কোন দেশের স্ত্রীরই নেই। আমার ত মনে হয়, ও জিনিস হারানোর চেয়ে মরণ ভাল ; তার পরেও বেঁচে থাকা শুধু বিড়ম্বনা।

আমি তা মানিনে।

মানো নিশ্চয়ই, বলিয়া বিমলা হাসিয়া ফেলিল। তাহার সহসা মনে হইল, এ সমস্তই পরিহাস। সত্যই ত পরিহাস ভিন্ন নারীর মুখে ইহা আর কি হইতে পারে! কহিল, কিন্তু তাও বলি বৌ, আমার কাছে যা মুখে আসে বল্‌চ, কিন্তু দাদার সামনে এ-সব নিয়ে বেশী চালাকি কোরো না। কেন না, পুরুষমানুষ যতই বুদ্ধিমান হোন্, অনেক সময়ে—

কি—অনেক সময়ে?

তামাসা, কি না, ধরতে পারে না।

সে তাঁর কাজ। আমি তা নিয়ে দুর্ভাবনা করিনে।

কিন্তু আমি যে না ভেবে থাকতে পারিনে বৌ।

ইন্দু জোর করিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিল, কেন বলত?

বিমলা একটুখানি ভাবিয়া বলিল, রাগ কোরো না বৌ; কিন্তু সেই অসুখের সময় আমার সত্যিই মনে হয়েছিল, দাদা যে তোমাকে পাবার জন্যে এক সময় পাগল হ'য়ে উঠেছিলেন, সেই যে কি বলে 'পায়ে কাঁটা ফুটলে বুক পেতে দেওয়া'—কিন্তু, সে ভাব আর বুঝি নেই।

হঠাৎ ইন্দুর সমস্ত মুখের উপর কে যেন কালি লেপিয়া

দিল ! তার পরে, সে জোর করিয়া শুক্‌নো হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল, তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ ঠাকুরঝি, তোমার দাদাকে বোলো, আমি ভ্রূক্ষেপও করিনে। আর তুমিও ভাল ক'রে বুঝো, আমার নিজের ভালমন্দ নিজেই সামলাতে জানি ; তা নিয়ে পরের মাথা গরম করাটাও আবশ্যক মনে করিনে।

* * * *

ফিরিয়া আসিয়া ইন্দু স্বামীর ঘরে ঢুকিয়াই প্রশ্ন করিল, আমি মেদিনীপুরে গেলে তোমার ব্যামো হ'য়েছিল ?

নরেন্দ্র খাতা হইতে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, না, ব্যামো নয়—সেই ব্যথাটা।

খরচ বাঁচাবার জন্যে, ঠাকুরঝির ওখানে গিয়ে পড়েছিলে ?

স্ত্রীর এই অত্যন্ত কটু ইঙ্গিতে নরেন্দ্র খাতার উপর পুনর্ব্বার ঝুঁকিয়া পড়িয়া, কয়েক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, বিমলা এসে নিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আমি শুন্‌তে পেলে ব'লে দিতাম, অক্ষমদের জন্যই হাসপাতাল সৃষ্টি হয়েচে। পরের ঘাড়ে না চ'ড়ে সেইখানে যাওয়াই তাদের উচিত।

নরেন্দ্র আর মুখ তুলিল না—একটি কথাও কহিল না।

ইন্দু টান মারিয়া পর্দ্দাটা সরাইয়া বাহির হইয়া গেল। ধাক্কা লাগিয়া একটা ক্ষুদ্র টিপাই ফুলদানি-সমেত উল্টাইয়া পড়িল ; সে ফিরিয়াও চাহিল না।

মিনিট-পাঁচেক পরে, তেমনি সজোরে পর্দ্দা সরাইয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, ঠাকুরঝি খবর দিতে চেয়েছিলেন, তুমি মানা

করেছিলে কি জন্যে? ভেবেছিলে বুঝি আমি এসে ওষুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেব?

নরেন্দ্র মুখ না তুলিয়াই বলিল, না, ভাবিনি। তোমার শরীর ভাল ছিল না—

ভালই ছিল। যদিও খবর পেয়েও আমি আস্‌তুম না, সে নিশ্চয়। কিন্তু, আমি সেখানে যে রোগে মরে যাচ্ছিলাম এ কথাও তোমাকে চিঠিতে লিখিনি। অনর্থক কতকগুলো মিথ্যে কথা ব'লে ঠাকুরঝিকে নিষেধ করবার হেতু ছিল না। বলিয়া সে যেমন করিয়া আসিয়াছিল, তেম্‌নি করিয়া চলিয়া গেল। নরেন্দ্রও তেমনি করিয়া খাতাটার পানে ঝুঁকিয়া রহিল, কিন্তু সমস্ত লেখা লেপিয়া মুছিয়া, চোখের সুমুখে একাকার হইয়া রহিল।

* * * *

ইন্দু পর্দ্দার অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া ডাক্তারকে কহিল, আপনিই গগনবাবুর বাড়ীতে আমার স্বামীর চিকিৎসা করেছিলেন?

বুড়া ডাক্তার চোখ তুলিয়া ইন্দুর উদ্বেগ-মলিন মুখখানির পানে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন।

ইন্দু কহিল, কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়েছেন ব'লে আমার মনে হয় না। এই আপনার ফির টাকা—আজ একবার ওবেলা যদি দয়া করে বন্ধুভাবে এসে তাঁকে দেখে যান, বড় উপকার হয়।

ডাক্তার কিছু বিস্মিত হইলেন। ইন্দু বুঝাইয়া বলিল, ওঁর স্বভাব চিকিৎসা করতে চান না। ওষুধের প্রেসক্রিপসনটা আমাকে লুকিয়ে দেবেন। তাঁকে একটু বুঝিয়ে বলবেন।

ডাক্তার সম্মত হইয়া বিদায় লইলেন।

রামটহল আসিয়া সংবাদ দিল, মাজী বল্লভ স্যাকরা এসেচে।

এসেচে? এদিকে ডেকে আন।

ও বল্লভ, একটু কাজের জন্য তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম, তুমি আমাদের বিশ্বাসী লোক—এই চুড়ি ক'গাছা বিক্রী ক'রে দিতে হবে। বড় পুরোনো ধরণের চুড়ি বাপু, আর পরা যায় না। এ দামে নতুন এক জোড়া কিনব মনে কচ্চি।

বেশ ত মা, বিক্রী ক'রে দেব।

নিক্তি এনেচ ত? ওজন ক'রে দেখ দেখি কত আছে? দামটা কিন্তু বাপু আমাকে কাল দিতে হবে। আমার দেরী হ'লে চল্‌বে না।

তাই দেব।

বল্লভ চুড়ি হাতে করিয়া বলিল, এ যে একেবারে টাট্‌কা জিনিস মা! বেচলেই ত কিছু লোকসান হবে।

তা হোক্ বল্লভ। এ গড়নটা আমার মনে ধরে না। আর দেখ, এ সম্বন্ধে বাবুকে কোনও কথা বোলো না।

বাবুদের লুকাইয়া অলঙ্কার বেচা-কেনার ইতিহাস বল্লভের অবিদিত ছিল না। একটু হাসিয়া চুড়ি লইয়া গেল।

ডাক্তারবাবু, পাঁচ-সাত শিশি ওষুধ খেলেন, কিন্তু বুকের ব্যথাটা ত গেল না।

গেল না? কৈ, তিনি ত কিছু বলেন না।

জানেন ত, ঐ তাঁর স্বভাব; কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি একটু ব্যথা লেগেই আছে—তা ছাড়া, শরীর ত সারচে না?

ডাক্তার চিন্তা করিয়া কহিলেন, দেখুন, আমারও সন্দেহ হয়, শুধু ওষুধে কিছু হবে না। একবার জল-হাওয়া পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

তাই কেন তাঁকে বলেন না?

বলেছিলাম একদিন। তিনি কিন্তু প্রয়োজন মনে করেন না।

ইন্দু রুষ্ট হইয়া বলিয়া ফেলিল, তিনি মনে না কর্‌লেই হবে? আপনি ডাক্তার, আপনি যা বল্‌লেন, তাই ত হওয়া উচিত।

বৃদ্ধ চিকিৎসক একটু হাসিলেন।

ইন্দু নিজের উত্তেজনায় লজ্জিত হইয়া বলিল, দেখুন, আমি বড় ব্যাকুল হ'য়ে পড়েচি। আপনি ওঁকে খুব ভয় দেখিয়ে দিন।

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, এ সকল রোগে ভয় ত আছেই।

ইন্দুর মুখ পাংশু হইয়া গেল, কহিল, সত্যি ভয় আছে?

তাহার মুখের পানে চাহিয়া ডাক্তার সহসা জবাব দিতে পারিলেন না।

ইন্দুর চোখে জল আসিয়া পড়িল; বলিল, আমি আপনার

মেয়ের মত ডাক্তারবাবু, আমাকে লুকোবেন না। কি হয়েচে, আমাকে খুলে বলুন।

ঠিক যে কি হইয়াছে, তাহা ডাক্তার নিজেও জানিতেন না। তিনি নানারকম করিয়া যাহা কহিলেন, তাহাতে ইন্দুর ভয় ঘুচিল না। সে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিকাল-বেলা নরেন্দ্র হাতের কলমটা রাখিয়া দিয়া, খোলা জানালার বাহিরে চাহিয়া ছিল, ইন্দু ঘরে ঢুকিয়া অদূরে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। নরেন্দ্র একবার মুখ ফিরাইয়া, আবার সেই দিকেই চাহিয়া রহিল।

কিছুদিন হইতে ইন্দু টাকা চাহে নাই, আজ সে যে কি জন্য আসিয়া বসিল, তাহা নিশ্চয় অনুমান করিয়া তাহার বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল।

ইন্দু টাকা চাহিল না; কহিল, ডাক্তারবাবু বলেন, ব্যথাটা যখন ওষুধে যাচ্ছে না, তখন হাওয়া বদলানো দরকার। একবার কেন বেড়াতে যাও না!

নরেন্দ্র বাস্তবিকই চমকিয়া উঠিল। বহুদিন অজ্ঞাত বড় স্নেহের ধন, যেন কোথায় লুকাইয়া তাহাকে ডাক দিল। ইন্দুর এই কণ্ঠস্বর, সে ত ভুলিয়াই গিয়াছিল। তাই মুখ ফিরাইয়া হতবুদ্ধির মত চাহিয়া ক্ষণকালের জন্য কি যেন মনে মনে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল।

ইন্দু কহিল, কি বল? তা হ'লে কালই গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক্। বেশি দূরে কাজ নেই—এই বদ্দিনাথের কাছে—আমরা দু'জন, কমলা আর ঝি—রামটহল পুরোনো

বিশ্বাসী লোক, বাড়ীতেই থাক্। সেখানে একটা ছোট বাড়ী নিলেই হবে! তা হ'লে আজ থেকেই গুছোতে আরম্ভ করুক না কেন?

কোন প্রকার খরচের কথাতেই নরেন্দ্র ভয় পাইত; এই একটা বড় রকমের ইঙ্গিতে তাহার মেজাজ একেবারে বিগড়াইয়া গেল। প্রশ্ন করিল, এই ডাক্তারটিকে আসতে বল্‌লে কে?

ইন্দু জবাব দিবার পূর্ব্বে সে পুনরায় কহিল, বিমলাকে বোলো আমার পিছনে ডাক্তার লাগিয়ে উত্ত্যক্ত করবার আবশ্যক নেই, আমি ভাল আছি।

বিমলা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ডাক্তার পাঠাইতেছে,—বিমলাই সব। ইন্দু অন্তরে আঘাত পাইল। তবু চাপা দিয়া বলিল, কিন্তু তুমি ত সত্যই ভাল নেই! ব্যথাটা ত সারেনি।

সেরেচে।

তা হ'লেও শরীর সারেনি—বেশ দেখতে পাচ্চি। একবার ঘুরে এলে, আর যাই হোক্—মন্দ কিছু ত হবে না?

নরেন্দ্র ভিতরে-বাহিরে এমন জায়গায় উপস্থিত হইয়াছিল, যেখানে সহ্য করিবার ক্ষমতা নিঃশেষ হইয়াছিল। তবুও ধাক্কা সামলাইয়া বলিল, আমার ঘুরে বেড়াবার সামর্থ্য নেই।

ইন্দু জিদ্ করিয়া বলিল, সে হবে না। প্রাণটা ত বাঁচান চাই।

এই জিদ্‌টা ইন্দুর পক্ষে এতই নূতন যে, নরেন্দ্র সম্পূর্ণ ভুল করিল। তাহার নিশ্চয়ই মনে হইল, তাহাকে ক্লেশ দিবার ইহা একটা অভিনব কৌশল মাত্র। এতদিনের ধৈর্য্যের বাঁধন,

তাহার নিমেষে ছিন্ন হইয়া গেল। চেঁচাইয়া উঠিল, কে বল্‌লে প্রাণ বাঁচান চাই? না, চাই না। তোমার পায়ে পড়ি ইন্দু, আমাকে রেহাই দাও, আমি নিশ্বাস ফেলে বাঁচি।

স্বামীর কাছে কটুকথা শোনা ইন্দু কল্পনা করিতেও পারিত না। সে কেমন যেন জড়-সড় হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু নরেন্দ্র জানিতে পারিল না; বলিতে লাগিল, তুমি জান, আমি কি সঙ্কটের মাঝখানে দিন কাটাচ্চি। সমস্ত জেনে-শুনেও আমাকে কেবল কষ্ট দেবার জন্যেই অহর্নিশি খোঁচাচ্চ। কেন, কি করেচি তোমার? কি চাও তুমি?

ইন্দু ভয়ে বিবর্ণ হইয়া চাহিয়া রহিল। একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

চেঁচামেচি, উত্তেজনা নরেন্দ্রের পক্ষে যে কিরূপ অস্বাভাবিক, তাহা এইবার সে নিজেই টের পাইল। কণ্ঠস্বর নত করিয়া বলিল, বেশ, স্বীকার করলুম আমার হাওয়া বদলান আবশ্যক, কিন্তু কি ক'রে যাব? কোথায় টাকা পাব? সংসার খরচ যোগাতেই যে আমার প্রাণ বার হ'য়ে যাচ্চে!

ইন্দু নিজে কোনও দিন ধৈর্য্য শিক্ষা করে নাই; অবনত হইতে তাহার মাথা কাটা যাইত। আজ কিন্তু সে ভয় পাইয়াছিল। নম্রকণ্ঠে কহিল, টাকা নেই বটে, কিন্তু অনেক টাকার গয়না ত আমাদের আছে—

আছে; কিন্তু আমাদের নেই—তোমার আছে। তোমার বাবা দিয়েচেন—তোমাকে। আমার তাতে একবিন্দুও অধিকার নেই, এ কথা আমার চেয়ে তুমি নিজেই ঢের বেশী জান।

বেশ, তা না নাও—আমি নগদ টাকা দিচ্চি!

কোথায় পেলে? সংসার খরচ থেকে বাঁচিয়েচ!

ইহা চুড়ি বিক্রীর টাকা। ইন্দু সহজে মিথ্যা কহিতে পারিত না। ইহাতে তাহার বড় অপমান বোধ হইত। আজ কিন্তু সে মিথ্যা বলিল। নরেন্দ্রের মুখের ভাব ভয়ানক কঠিন হইল। ধীরে ধীরে বলিল, তা হ'লে রেখে দাও গয়না গড়িয়ো। আমার বুকের রক্ত জল ক'রে যা জমা হয়েচে, তা এভাবে নষ্ট হ'তে পারে না। ইন্দু কখনও তোমাকে কটুকথা বলিনি, চিরদিনই শুনেই আস্‌চি। কিন্তু তুমি না সেদিন দম্ভ ক'রে বলেছিলে, কখনও মিথ্যে কথা বল না? ছিঃ—

কমলা পর্দ্দা ফাঁক করিয়া ডাকিল, মা, পিসিমা এসেচেন।

কি হচ্চে গো বৌ? বলিয়া বিমলা ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল; ইন্দু মেয়েকে আনিয়া, তাহার গলার হারটা দুই হাতে সজোরে ছিঁড়িয়া, স্বামীর মুখের সামনে ছুড়িয়া দিয়া কহিল, মিথ্যে বল্‌তে আমি জানতাম না—তোমার কাছেই শিখেচি। তবু এখনও পেতলকে সোনা ব'লে চালাতে শিখিনি। যে স্ত্রীকে ঠকায়, নিজের মেয়েকে ঠকায়, তার আর কি বাকী থাকে। সে অপরকে মিথ্যাবাদী বলে কি ক'রে!

নরেন্দ্র ছিন্ন হারটা তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কি ক'রে জানলে পেতল! যাচাই করিয়েচ!

তোমার বোনকে যাচাই ক'রে দেখ্‌তে বল। বলিয়া সে দুই চোখ রাঙা করিয়া বিমলার দিকে চাহিল।

বিমলা দু'পা পিছাইয়া গিয়া বলিল, ওকাজ আমার নয়

বৌ, আমি এত ইতর নই যে, দাদার দেওয়া গয়না স্যাকরা ডেকে যাচাই ক'রে দেখব।

নরেন্দ্র কহিল, ইন্দু, তোমাকেও দু-একখানা গয়না দিয়েচি, সেগুলো যাচাই ক'রে দেখেচ?

দেখিনি, কিন্তু এবার দেখ্‌তে হবে।

দেখো, সেগুলো পেতল নয়।

ভগিনীর মুখের পানে চাহিয়া হারটা দেখাইয়া কহিল, এটা সোনা নয় বোন, পেতলই বটে। যে দুঃখে বাপ হ'য়ে ঐ একটি মেয়ের জন্মদিনে তাকে ঠকিয়েচি, সে তুই বুঝবি। তবুও, মেয়েকে ঠকাতে পেরেচি, কিন্তু নিজের স্ত্রীকে ঠকাতে সাহস করিনি।

৭

কথা শোন বৌ; একবার পায়ে হাত দিয়ে তাঁর ক্ষমা চাওগে।

কেন, কি দুঃখে? আমার মাথা কেটে ফেল্‌লেও আমি তা পারব না ঠাকুরঝি।

কেন পারবে না? স্বামীর পায়ে হাত দিতে লজ্জা কি? বেশ ত, তোমার দোষ না হয় নেই, কিন্তু তাঁকে প্রসন্ন করা যে সকল কাজের বড়।

না—আমার তা নয়। ভগবানের কাছে খাঁটি থাকাই আমার সকল কাজের বড়। যতক্ষণ সে অপরাধ না করচি, ততক্ষণ আর কিছুই ভয় করিনে!

বিমলা রাগিয়া বলিল, বৌ, এ সব পাকামির কথা আমরাও জানি, তখন কিছুই কোন কাজে আসবে না ব'লে দিচ্চি। চোখ বুজে বিপদ এড়ানো যায় না। দাদা সত্যই তোমার ওপর বিরক্ত হ'য়ে উঠচেন!

ইন্দু উদাসভাবে বলিল; তাঁর ইচ্ছে।

বিমলা মনে মনে অত্যন্ত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, সেই ইচ্ছে টের পাবে—যেদিন সর্ব্বনাশ হবে। দাদা যেমন নিরীহ তেম্‌নি কঠিন :—তাঁব এ-দিক দেখেচ, ও-দিক দেখতে এখনো বাকী আছে—তা ব'লে দিচ্চি।

আচ্ছা, দেখতে পেলে তোমাকে খবর দিয়ে আসব।

বিমলা আর কিছুই বলিল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে বলিল, তা সত্যি। বিশ্বাস হয় না বটে, স্বামীর স্নেহে বঞ্চিত হ'ব। কিন্তু সে-মানুষ যে দাদা নয়—অসুখের সময় তাকে ভাল ক'রে চিনেচি। বুকের কপাট তাঁর একবার বন্ধ হ'য়ে গেলে, আর খোলা পাবে না।

এইবার ইন্দুও মুখ গম্ভীর করিল। কহিল, খোলা না পাই, বাইরেই থাক্‌ব। খুলে দেবার জন্য তাঁর পায়ে ধরেও সাধ্‌ব না—তোমাকেও সুপারিশ করতে ডাক্‌ব না। ওকি—রাগ ক'রে চল্‌লে না কি?

বিমলা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, রাগ নয়—দুঃখ ক'রেই যাচ্চি। বৌ, নিজের বোনের চেয়েও তোমাকে বেশী ভালবেসেচি ব'লেই প্রাণটা কেঁদে কেঁদে ওঠে। দাদা যে অমন ক'রে বল্‌তে পারেন, আমি চোখে দেখে না গেলে বিশ্বাসই করতুম না!

ইন্দু হঠাৎ একটু হাসিয়া বলিল, অত বক্তৃতা আর কখনো তাঁর মুখে শুন্‌বে না।

বক্তৃতা তুমিও কিছু কম করনি বৌ। তবে তিনি যে আর কখনো করবেন না, তা আমারও মনে হয়। এক কথা একশবার বল্‌বার লোক তিনি নন।

ইন্দু আবার হাসিয়া বলিল,—সেও বটে—তবে আর একটা গুরুতর কারণ ঘটেচে, যাতে আর কোনদিন স্বপ্নেও চোখ রাঙাতে সাহস করবেন না। আমার বাবার চিঠি পেলুম। তিনি আমার নামে দশ হাজার টাকা উইল ক'রে দিয়েছেন। কি বল ঠাকুরঝি, পায়ে ধরবার আর দরকার আছে ব'লে মনে হয়?

বিমলার মুখ যেন আরও অন্ধকার হইয়া গেল। বলিল, বৌ, এর পূর্ব্বে কখনো তোমাকে তিনি চোখ রাঙাননি। যা ক'রে তাঁকে ফেলে রেখে তুমি মেদিনীপুরে গিয়েছিলে, সে আমি ত জানি; কিন্তু তবুও কোনদিন এতটুকু তোমার নিন্দে ক'রেন নি। হাসিমুখে তোমার সমস্ত দোষ, আমার কাছেও ঢেকে রেখেছিলেন—সে কি তোমার টাকার লোভে? বৌ, শ্রদ্ধা ছাড়া ভালবাসা থাকে না। যে জিনিস তুমি তেজ ক'রে হেলায় হারাচ্চ—সেইদিন টের পাবে, যেদিন যথার্থ-ই হারাবে। কিন্তু এই একটা কথা আমার মনে রেখ বৌ, আমার দাদা অত নীচ নয়। আর না; সন্ধ্যা হয়—চল্‌লুম, কাল পরশু একবার সময় হ'লে আমাদের বাড়ী এসো।

আচ্ছা। বলিয়া ইন্দু পিছনে পিছনে সদর দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মৃদু পদশব্দ বিমলা যে শুনিয়াও

শুনিল না, তাহা সে বুঝিল। গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে মুখ বাড়াইয়া চিরদিন এই ছুটি সখী, পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করিয়া, হাসিয়া কপাট বন্ধ করে। আজ গাড়ীতে ঢুকিয়াই বিমলা দরজা টানিয়া দিল।

ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ইন্দু কমলাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল।

বিমলা চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার খরতপ্ত কথাগুলা রাখিয়া গেল। ইহার উত্তাপ যে কত, এইবার ইন্দু টের পাইল। এই তাপে তাহার অহঙ্কারের অভ্রভেদী তুষারস্তূপ যতই গলিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল, ততই এক একটি নূতন বস্তু তাহার চোখে পড়িতে লাগিল। এত কাদামাটি—আবর্জ্জনা—এত কর্কশ-কঠিন শিলাখণ্ড যে এই ঘনীভূত জলতলে আবৃত হইয়া ছিল, তাহা সে ত স্বপ্নেও ভাবে নাই!

হঠাৎ তাহার অন্তরের ভিতর হইতে কে যেন জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, এ কেমন হয় ইন্দু, যদি তিনি মনে মনে তোমাকে ত্যাগ করেন? তুমি কাছে গিয়ে বসলেও যদি তিনি ঘৃণায় স'রে বসেন?

তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল!

কমলা কহিল, কি মা?

ইন্দু তাহাকে সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, তাহার মুখে চুমা খাইয়া বলিল, তোর পিসিমা এত ভয় দেখাতেও পারে!

কিসের ভয়, মা?

ইন্দু আর একটা চুমা খাইয়া বলিল, কিছু না মা, সব মিথ্যে

—সব মিথ্যে। যা ত মা, দেখে আয় ত তোর বাবা কি কচ্চেন ?

মেয়ে ছুটিয়া চলিয়া গেল। আজ দুদিন স্বামী-স্ত্রীতে একটা কথাও হয় নাই। কমলা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, বাবা চুপ ক'রে শুয়ে আছেন।

চুপ ক'রে ? আচ্ছা, তুই শুয়ে থাক্ মা, আমি দেখে আসি, বলিয়া ইন্দু নিজে চলিয়া গেল। পর্দ্দার ফাঁক দিয়া দেখিল, তাই বটে। তিনি উপরের দিকে চাহিয়া সোফায় শুইয়া আছেন। মিনিট পাঁচ-ছয় দাঁড়াইয়া দেখিয়া ইন্দু ফিরিয়া আসিল। আজ প্রবেশ করিতে সাহস হইল না দেখিয়া সে নিজেই ভারি আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

কমলা ?

কি মা ?

তোর বাবার বোধ হয় খুব মাথা ধরেচে। যা মা, ব'সে ব'সে একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দিগে।

মেয়েকে পাঠাইয়া দিয়া ইন্দু নিজে আড়ালে দাড়াইয়া, উদ্‌গ্রীব হইয়া দুজনের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল।

কন্যা প্রশ্ন করিল, কেন এত মাথা ধরেচে বাবা ?

পিতা উত্তর দিলেন, কৈ, ধরেনি ত মা ?

কন্যা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, মা বল্‌ল যে খুব ধরেচে ?

পিতা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কন্যার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। একটু পরে বলিলেন, তোমার মা জানে না।

পর্দ্দা ঠেলিয়া ইন্দু সহজভাবে ঘরে ঢুকিল। টেবিলের আলোটা কমাইয়া দিয়া কহিল, রোগা শরীরে এত পরিশ্রম কি

সহ্য হয়? যা ত মা কমলা, ওপর থেকে ওডিকোলনের শিশিটা নিয়ে আয়—আর রামটহলকে একটু বরফ কিনে আন্‌তে ব'লে দে।

মেয়েকে তুলিয়া দিয়া ইন্দু শিয়রে আসিয়া বসিল। চুলের মধ্যে হাত দিয়া বলিল, আগুন উঠ্‌ছে যেন।

নরেন্দ্র চোখ বুজিয়া রহিল—কিছুই বলিল না। ইন্দু নীরবে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে ঈষৎ ঝুঁকিয়া সস্নেহ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আজ বুকের ব্যথাটা কেমন আছে?

তেম্‌নি।

তবে এই যে রাগ ক'রে দুদিন ওষুধ খেলে না, বেড়ে গেলে কি হবে বল ত?

নরেন্দ্র চোখ মেলিয়া শ্রান্তকণ্ঠে বলিল, আমার শরীরটা ভাল নেই—একটু চুপ ক'রে থাকতে চাই ইন্দু।

এই কথার এই জবাব!

ইন্দু তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তাই থাকো। আমার ঘাট হয়েচে, তোমার ঘরে ঢুকেছিলুম।

দ্বারের কাছে আসিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া বলিল, নিজের প্রাণটা নষ্ট ক'রে আমাকে শাস্তি দিতে পারবে না। এই চিঠিখানা প'ড়ে দেখ, বাবা আমাকে দশ হাজার টাকা উইল ক'রে দিয়েছেন। বলিয়া বাঁ হাতের চিঠিটা সোফার দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর মুখে আঁচল গুঁজিয়া কান্না চাপিতে চাপিতে নিজের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

কথা সহিতে, হার মানিতে সে শিখে নাই—অনেক নারীই শিখে না—তাই আজ তাহার সমস্ত সাধু-সঙ্কল্পই ব্যর্থ হইয়া গেল। সে কি করিতে গিয়া কি করিয়া ফিরিয়া আসিল!

৮

ও কি ঠাকুরঝি,—তোমরা কাঁদ্‌ছিলে নাকি? চোখ দুটি তোমাদের যে জবাফুল হয়েচে!

অম্বিকাবাবুর স্ত্রী শুনিতেছিলেন এবং বিমলা উপুড় হইয়া বই পড়িতেছিল; ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া চোখ মুছিয়া হাসিল,—উঃ! দুর্গামণির দুঃখে বুক ফেটে যায় বৌ!

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, কে দুর্গামণি?

ন্যাকা সেজো না বৌ। জান না, কে দুর্গামণি? চারিদিকে যে এত সুখ্যাতি বেরিয়েচে, তা ঠিক বটে।

ইন্দু আর কিছুই বুঝিল না, শুধু বুঝিল একখানা বইয়ের কথা হইতেছে। হাত বাড়াইয়া কহিল, দেখি বইটা।

হাতে লইয়া উপরেই দেখিল গ্রন্থকার—তাহার স্বামীর নাম লেখা। পাতা উল্টাইতেই চোখে পড়িল উৎসর্গ করা হইয়াছে বিমলাকে। ইন্দু বইখানা আগাগোড়া নাড়িয়া চাড়িয়া রাখিয়া দিল। লেখা হইয়াছে, ছাপা হইয়াছে, দেওয়া হইয়াছে—অথচ সে তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানে না। তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া বিমলা আর একটা প্রশ্ন করিতেও সাহস করিল না। তখন ইন্দু নিজেই বলিল, আমার নাটক নভেল পড়তে ইচ্ছেও

করে না, ভালও লাগে না। যা হোক ভাল হয়েছে শুনে সুখী হলুম।

অম্বিকাবাবুর চাকর আসিয়া তাঁহার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, বাবু জিজ্ঞাসা কচ্চেন, আজ তাঁর যে যাত্নঘর দেখ্তে যাবার কথা ছিল—যাবেন ?

এই বধূটি সকলের ছোট ; সে লজ্জা পাইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া, মৃত্নস্বরে কহিল, না, তাঁর শরীর এখনো সারেনি—আজ যেতে হবে না।

চাকর চলিয়া গেল, ইন্দু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, এমন আশ্চর্য্য কথা সে জীবনে শোনে নাই।

ভোলা আসিয়া বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু অফিস থেকে জান্‌তে লোক পাঠিয়েছেন—একটা বড আলমারি-দেরাজ নীলাম হচ্ছে। বড়ঘরের জন্য কেনা হবে কি ?

বিমলা কহিল, না, কিন্‌তে মানা করে দে। একটা ছোট বুককেস্ হ'লেই ওঘরের হবে।

ভোলা চলিয়া গেল। ইন্দু মহাবিস্ময়ে অবাক হইয়া বসিয়া রহিল। এই স্বামীদের প্রশ্নগুলোতেও সে বেশী প্রভুত্ব দেখিতে পাইল না, ইহাদের স্ত্রী ত্নটির আদেশগুলোও তাহার কাছে ঠিক দাসীদের মত শুনাইল না। অথচ, তাহার নিজের মনের মধ্যে কেমন যেন একটা ব্যথা বাজিতে লাগিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল, কি করিয়া যেন ইহাদের কাছে সে একেবারে ছোট হইয়া গিয়াছে।

যাইবার সময় বিমলা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, বৌ, সত্যি কি তুমি দাদার এই বইটার কথা জান্‌তে না ?

ইন্দু তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, না। আমার ওজন্যে মাথা ব্যথা করে না। সারাদিন বসেই ত লিখ্‌চে—কে অত খোঁজ করে বল ? ভাল কথা ঠাকুরঝি, কাল বাপের বাড়ী যাচ্ছি।

বিমলা উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, বৌ, না, যেয়ো না।

কেন ?

কেন সে কি বুঝিয়ে বলতে হবে বৌ ? দাদা তোমাকে তাঁর দুঃখের সুখের কোন ভারই দেন না—তাও কি চোখে দেখতে পাও না ? স্বামীর ভালবাসা হারাচ্চ—তাও কি টের পাও না ?

ইন্দু হঠাৎ রুষ্ট হইয়া বলিল, অনেকবার বলেচি তোমাকে, আমি চাইনে—চাইনে—চাইনে। আমি দাদার ওখানে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকব ; ইনি যেন আর আমাকে আন্‌তে না যান—আর যেন আমাকে জ্বালাতন না করেন।

এবার বিমলাও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কহিল, এ সব বড়াই পুরুষমানুষের কাছে কোরো বৌ, আমি ত মেয়েমানুষ আমার কাছে ও কোরো না। তোমার বাপেরা বড়লোক, তোমার সংস্থান তাঁরা ক'রে দিয়েছেন—এই তো তোমার অহঙ্কার ? আচ্ছা, এখন যাচ্ছ যাও, কিন্তু একদিন হুঁস হবে, যা হারালে তার তুলনায় সমস্ত পৃথিবীটাও ছোট। বৌ, যা তুমি পেয়েছিলে কম মেয়েমানুষেই তা পায়—সে জানি, কিন্তু যে অপব্যয় তুমি করলে তাতে অক্ষয়ও ক্ষ'য়ে শেষ হ'য়ে যায়। বোধ করি, গেলও তাই।

সেই বইখানা বিমলার হাতেই ছিল। তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় ইন্দুর বুকের ভিতরটা আর একবার হুহু করিয়া উঠিল। বলিল, অহঙ্কার কর্‌বার থাক্‌লেই লোকে করে; কিন্তু আমার সর্ব্বনাশ হয় হবে, যায় যাবে, সে জন্যে ঠাকুরঝি, তুমিই বা মাথা গরম কর কেন, আর আমিই বা যা-তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনি কেন? আমার থাক্‌তে ইচ্ছে নেই,—থাক্‌ব না। এতে যা হয় তা হবে—কারু পরামর্শ নিতেও চাইনে, ঝগড়া করতেও চাইনে।

বিমলা মৌন হইয়া রহিল। তাহার ব্যথা অন্তর্যামী জানিলেন, কিন্তু এ-অপমানের পরে আর সে তর্ক করিল না।

ইন্দু অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেই কহিল, দাঁড়াও ত বৌ, তুমি সম্পর্কে বড়, একটা প্রণাম করি।

৯

সেদিন সন্ধ্যা না হইতেই সমস্ত আকাশ ঝাঁপিয়া মেঘ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ইন্দু মেয়ে লইয়া বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। আজ তাহার ছোটভগিনীপতি আসিয়াছিলেন, পাশের ঘর হইতে তাঁহাকে খাওয়ানো-দাওয়ানো গল্পগুজবের অস্ফুট কলধ্বনি যতই ভাসিয়া আসিতে লাগিল, ততই কিসের অব্যক্ত লজ্জায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

তিন মাস হইতে চলিল, সে মেদিনীপুরে আসিয়াছে। ছোটভগিনীও আসিয়াছে। তাহার স্বামী এই দুই মাসের

মধ্যেই শান্তিপুর হইতে অন্ততঃ পাঁচ-ছয়বার আসা-যাওয়া করিলেন, কিন্তু নরেন্দ্র একটিবারও আসিলেন না, একখানা চিঠি লিখিয়াও খোঁজ করিলেন না।

কিছুদিন হইতে ব্যাপারটার উপর সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং প্রায়ই আলোচনা হইতেছে। ছোটভগিনীপতির ঘরে সকলের সম্মুখে পাছে এই কথাটাই উঠিয়া পড়ে, এই ভয়ে ইন্দু অসময়ে পলাইয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল।

স্বামী আসেন না। তাঁহার অবহেলায় বেদনা কত, সে ইন্দুর নিজের কথা—সে যাক্; কিন্তু ইহাতে এত যে ভয়ানক লজ্জা, এ কথা সে ত একদিনও কল্পনা করে নাই। ভ্রূণহত্যা, নরহত্যার মত এ যে কেবলই লুকাইয়া ফিরিতে হয়! মরিয়া গেলেও যে কাহারো কাছে স্বীকার করা যায় না, স্বামী ভালবাসেন না।

এতদিন স্বামীর ঘরে, স্বামীর পাশে বসিয়া তাঁহাকে টানিয়া পিটিয়া নিজের সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা বাড়াইয়া তুলিতেই সে অহরহ ব্যস্ত ছিল, কিন্তু এখন পরের ঘরে, চোখের আড়ালে সমস্ত যে ভাঙিয়া ধ্বসিয়া পড়িতেছে—কি করিয়া সে খাড়া করিয়া রাখিবে?

আজ ভগিনীপতি আসার পর হইতে যে-কেহ তাহার পানে চাহিয়াছে, তাহার মনে হইয়াছে, তাহাকে করুণা করিতেছে! কমলাকে কেহ তাহার পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ইন্দু মরমে মরিয়া যায়, বাড়ী ফিরিবার প্রশ্ন করিলে, লজ্জায় মাটিতে মিশিতে চায়।

অথচ, আসিবার পূর্ব্বে স্বামীকে সে অনেকগুলো মর্ম্মান্তিক কথায় বলিয়া আসিয়াছিল, প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা হইলে যেন লইয়া আসে!

হঠাৎ ইন্দুর মোহের ঘোর কাটিয়া গেল—কমলা, কাঁদ্‌চিস্ কেন মা? কমলা রুদ্ধস্বরে বলিল, বাবার জন্যে মন কেমন কচ্চে।

ইন্দুর বুকের উপর যেন হাতুড়ির ঘা পড়িল, সে মেয়েকে প্রাণপণে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বাহিরের প্রবল বারিবর্ষণ তাহার লজ্জা রক্ষা করিল—কন্যা ছাড়া এ কান্না আর কেহ শুনিতে পাইল না।

তাহার জননী শিখাইয়া দিলেন কি না জানি না, পরদিন সকাল হইতেই কমলা পিতার কাছে যাইবার জন্য বায়না ধরিয়া বসিল। প্রথমে ইন্দু অনেক তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া, শেষে দাদাকে আসিয়া কহিল, কমলা কিছুতেই থামে না—কলকাতায় যেতে চায়।

দাদা বলিলেন, থামবার দরকার কি বোন, কাল সকালেই তাকে নিয়ে যা। কেমন আছে নরেন? সে আমাকে ত চিঠিপত্র লেখে না, তোকে লেখে ত?

ইন্দু ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, হুঁ।

ভাল আছে ত?

ইন্দু তেমনি করিয়া জানাইল, আছেন।

* * * *

বিমলা অবাক্ হইয়া গেল—কখন্ এলে বৌ?

এই আস্‌চি।

ভৃত্য গাড়ী হইতে ইন্দুর তোরঙ্গ নামাইয়া আনিল। বিমলা দারুণ বিরক্তি কোনমতে চাপিয়া কহিল, বাড়ী যাওনি ?

না। শুধু কমলাকে সুমুখ থেকে নামিয়ে দিয়ে এসেছি। শুধু তার জন্যেই আসা—নইলে আস্‌তুম না।

বিমলা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, না এলেই ভাল করতে বৌ। ওখানে তোমার আর গিয়েও কাজ নেই।

ইন্দু বুকের ভিতরটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল—কেন ঠাকুরঝি ?

বিমলা সহজ গম্ভীরভাবে কহিল, পরে শুনো। কাপড় ছাড়, মুখ হাত ধোও—যা হবার, সে ত হ'য়েই গেছে—এখন, আজ শুনলেও যা, দুদিন পরে শুন্‌লেও তাই !

ইন্দু বসিয়া পড়িল। তাহার সমস্ত মুখ নীলবর্ণ হইয়া গেল, বলিল, সে হবে না ঠাকুরঝি, না শুনে আমি একবিন্দু জলও মুখে দেব না। তাঁকে দেখ্‌তে পেয়েচি, তিনি বেঁচে আছেন—তবুও সেখানে আমার গিয়ে কাজ নেই কেন ?

বিমলা খানিক থামিয়া, দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সত্যিই ওবাড়ীতে তোমার জায়গা নেই। এখন তোমার পক্ষে এখানেও যা, বাপের বাড়ীতেও তাই। ওবাড়ীতে তুমি থাক্‌তে পার্‌বে না।

ইন্দু কান্না চাপিয়া বলিয়া উঠিল, আমি আর সইতে পারিনে ঠাকুরঝি, কি হয়েচে, খুলে বল। বিয়ে করেচেন ?

বিশ্বাস হয় ?

না। কিছুতে না। আমার অপরাধ যত বড়ই হোক, কিন্তু তিনি অন্যায় কিছুতে করতে পারেন না। তবু কেন

আমার তাঁর পাশে স্থান নেই, বল্‌বে না? বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ বহিয়া ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বিমলার নিজের চক্ষুও আর্দ্র হইয়া উঠিল, কিন্তু অশ্রু ঝরিল না; বলিল, বৌ, আমি ভেবে পাইনে কি ক'রে তোমাকে বোঝাব, সেখানে আর তোমার স্থান নেই। শম্ভুবাবু দাদাকে জেলে দিয়েছিল।

ইন্দুর সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল—তার পরে?

বিমলা বলিল, আমরা তখন কাশীতে। শম্ভুবাবু টাকা যোগাড় কর্‌বার দু'দিন সময় দেয়; কিন্তু চার হাজার টাকা যোগাড় হ'য়ে উঠে না। ধরে নিয়ে যাবার পরে দাদা ভোলাকে আমার কাছে কাশীতে পাঠিয়ে দেন, কিন্তু আমরা তখন এলাহাবাদে চ'লে যাই। সে ফিরে আসে, আবার যায়; ঐ রকম ক'রে দশ দিন দেরী হয়ে যায়। তার পরে আমি এসে পড়ি। আমার কাছেও নগদ টাকা ছিল না, আমার গয়নাগুলো বাঁধা দিয়ে, এগার দিনের দিন দাদাকে বার ক'রে নিয়ে আসি। তোমারও ত চার-পাঁচ হাজার টাকার গয়না আছে বৌ, মেদিনীপুরও দূর নয়, তোমাকে খবর দিতে পার্‌লে, এ সব কিছুই হ'তে পার্‌ত না। দাদা বরং দশদিন জেলভোগ কর্‌লেন, কিন্তু তোমার কাছে হাত পাত্‌লেন না! আর তোমার তাঁর কাছে গিয়ে কি হবে? অনেক সুখই ত তাঁকে তুমি দিলে, এবার মুক্তি দাও—তিনিও বাঁচুন তুমিও বাঁচ।

ইন্দু এক মুহূর্ত্ত মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর একে একে গায়ের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া, বিমলার

পায়ের কাছে ধরিয়া দিয়া বলিল, এই দিয়ে তোমার নিজের জিনিস উদ্ধার ক'রে এনো ঠাকুরঝি,—আমি তাঁর কাছেই চললাম। তুমি বল্‌চ স্থান হবে না,—কিন্তু আমি বল্‌চি, এইবারেই আমার তাঁর পাশে যথার্থ স্থান হবে। যা এতদিন আমাকে আলাদা ক'রে রেখেছিল, এখন তাই তোমার কাছে ফেলে দিয়ে, আমি নিজের স্থান নিতে চল্‌লুম। কাল একবার যেয়ো ভাই,—গিয়ে তোমার দাদা আর বৌকে দেখে এসো,—চল্‌লুম! বলিয়া ইন্দু গাড়ীর জন্য অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

ওরে ভোলা; সঙ্গে যা, বলিয়া বিমলা চোখ মুছিয়া পিছনে পিছনে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।

আঁধারে আলো

১

সে অনেক দিনের ঘটনা। সত্যেন্দ্র চৌধুরী জমিদারের ছেলে; বি-এ পাশ করিয়া বাড়ী গিয়াছে, তাহার মা বলিলেন, মেয়েটি বড় লক্ষ্মী—বাবা কথা শোন, একবার দেখে আয়।

সত্যেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল, না মা, এখন আমি কোন মতেই পার্‌ব না। তা হ'লে পাশ হ'তে পার্‌ব না!

কেন পার্‌বিনে? বৌমা থাকবেন আমার কাছে, তুই লেখাপড়া কর্‌বি কলকাতায়, পাশ হ'তে তোর কি বাধা হবে, আমি ত ভেবে পাইনে, সতু!

না মা, সে সুবিধে হবে না—এখন আমার সময় নেই, ইত্যাদি বলিতে বলিতে সত্য বাহির হইয়া যাইতেছিল।

মা বলিলেন, যাস্‌নে, দাঁড়া, আরও কথা আছে। একটু থামিয়া বলিলেন, আমি কথা দিয়েছি বাবা, আমার মান রাখ্‌বিনে?

সত্য ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অসন্তুষ্ট হইয়া কহিল, না জিজ্ঞাসা ক'রে কথা দিলে কেন?

ছেলের কথা শুনিয়া মা অন্তরে ব্যথা পাইলেন, বলিলেন, সে আমার দোষ হয়েছে, কিন্তু তোকে ত মায়ের সম্ভ্রম বজায় রাখ্‌তে হবে। তা ছাড়া, বিধবার মেয়ে বড় দুঃখী—কথা শোন্ সত্য, রাজী হ।

আচ্ছা, পরে বল্‌ব, বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

মা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঐটি তাঁহার একমাত্র সন্তান। সাত-আট বৎসর হইল, স্বামীর কাল হইয়াছে, তদবধি বিধবা নিজেই নায়েব-গোমস্তার সাহায্যে মস্ত জমিদারী শাসন করিয়া আসিতেছেন। ছেলে কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়ে, বিষয়-আশয়ের কোন সংবাদই তাহাকে রাখিতে হয় না। জননী মনে মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, ছেলে ওকালতি পাশ করিলে তাহার বিবাহ দিবেন এবং পুত্র পুত্রবধূর হাতে জমিদারী এবং সংসারের সমস্ত ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি ছেলেকে সংসারী করিয়া, তাহার উচ্চশিক্ষার অন্তরায় হইবেন না; কিন্তু অন্যরূপ ঘটিয়া দাঁড়াইল। স্বামীর মৃত্যুর পর এবাটীতে এতদিন পর্য্যন্ত কোন কাজ-কর্ম্ম হয় নাই। সেদিন কি একটা ব্রত উপলক্ষে সমস্ত গ্রাম নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, মৃত অতুল মুখুয্যের দরিদ্র বিধবা এগারো বছরের মেয়ে লইয়া নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়াছিলেন। এই মেয়েটিকে তাঁহার বড় মনে ধরিয়াছে। শুধু যে মেয়েটি নিখুঁত সুন্দরী তাহা নহে, ঐটুকু বয়সেই মেয়েটি যে অশেষ গুণবতী তাহাও তিনি দুই-চারিটি কথাবার্ত্তায় বুঝিয়া লইয়াছিলেন।

মা মনে মনে বলিলেন, আচ্ছা, আগে ত মেয়ে দেখাই, তার পর কেমন না পছন্দ হয়, দেখা যাবে।

পরদিন অপরাহ্ণ-বেলায় সত্য খাবার খাইতে মায়ের ঘরে ঢুকিয়াই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার খাবারের যায়গার ঠিক

সুমুখে আসন পাতিয়া বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীঠাকরুণটিকে হীরামুক্তায় সাজাইয়া বসাইয়া রাখিয়াছে।

মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, খেতে ব'স্।

সত্যর চমক ভাঙিল। সে থতমত খাইয়া বলিল, এখানে কেন, আর কোথাও আমার খাবার দাও।

মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তুই ত আর সত্যিই বিয়ে কর্‌তে যাচ্চিস্ নে—ঐ এক ফোঁটা মেয়ের সামনে তোর লজ্জা কি!

আমি কারুকে লজ্জা করিনে, বলিয়া সত্য প্যাঁচার মত মুখ করিয়া সুমুখের আসনে বসিয়া পড়িল। মা চলিয়া গেলেন। মিনিট-দুয়ের মধ্যে সে খাবারগুলো কোনমতে নাকে মুখে গুঁজিয়া উঠিয়া গেল।

বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ইতিমধ্যে বন্ধুরা জুটিয়াছে এবং পাশার ছক পাতা হইয়াছে। সে প্রথমেই দৃঢ় আপত্তি প্রকাশ করিয়া কহিল, আমি কিছুতেই বস্‌তে পার্‌ব না—আমার ভারী মাথা ধরেছে! বলিয়া ঘরের এক কোণে সরিয়া গিয়া তাকিয়া মাথায় দিয়া, চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। বন্ধুরা মনে মনে কিছু আশ্চর্য্য হইল এবং লোকাভাবে পাশা তুলিয়া, দাবা পাতিয়া বসিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনেক চেঁচামেচি ঘটিল কিন্তু সত্য একবার উঠিল না, একবার জিজ্ঞাসা করিল না—কে হারিল কে জিতিল। আজ এসব তাহার ভালই লাগিল না।

বন্ধুরা চলিয়া গেলে সে বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া সোজা নিজের ঘরে যাইতেছিল, ভাঁড়ারের বারান্দা হইতে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, এর মধ্যে শুতে যাচ্ছিস্ যে রে?

শুতে নয়, পড়তে যাচ্চি। এম-এ'র পড়া সোজা নয় ত! সময় নষ্ট কর্‌লে চল্‌বে কেন? বলিয়া সে গূঢ় ইঙ্গিত করিয়া দুম্ দুম্ শব্দ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

আধঘণ্টা কাটিয়াছে, সে একটি ছত্রও পড়ে নাই। টেবিলের উপর বই খোলা, চেয়ারে হেলান দিয়া উপরের দিকে মুখ করিয়া কড়িকাঠ ধ্যান করিতেছিল, হঠাৎ ধ্যান ভাঙিয়া গেল! সে কান খাড়া করিয়া শুনিল—ঝুম্। আর এক মুহূর্ত্ত—ঝুম্ ঝুম্। সত্য সোজা উঠিয়া বসিয়া দেখিল, সেই আপাদমস্তক গহনা-পরা। লক্ষ্মীঠাক্‌রুণটির মত মেয়েটি ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সত্য একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে বলিল, মা আপনার মত জিজ্ঞাসা কর্‌লেন।

সত্য মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, কার মা?

মেয়েটি কহিল, আমার মা।

সত্য তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর খুঁজিয়া পাইল না, ক্ষণেক পরে কহিল, আমার মাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেই জান্‌তে পার্‌বেন।

মেয়েটি চলিয়া যাইতেছিল, সত্য সহসা প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, তোমার নাম কি?

আমার নাম রাধারাণী, বলিয়া সে চলিয়া গেল।

এক ফোঁটা রাধারাণীকে সজোরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, সত্য এম-এ পাশ করিতে কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন মতেই না, খুব সম্ভব, পরেও না; সে বিবাহই করিবে না। কারণ, সংসারে জড়াইয়া গিয়া মানুষের আত্মসম্ভ্রম নষ্ট হইয়া যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবুও রহিয়া রহিয়া তাহার সমস্ত মনটা যেন একরকম করিয়া উঠে, কোথাও কোন নারীমূর্ত্তি দেখিলেই, আর একটি অতি ছোট মুখ তাহার পাশেই জাগিয়া উঠিয়া তাহাকেই আবৃত করিয়া দিয়া, একাকী বিরাজ করে, সত্য কিছুতেই সেই লক্ষ্মীর প্রতিমাটিকে ভুলিতে পারে না। চিরদিনই সে নারীর প্রতি উদাসীন, অকস্মাৎ এ তাহার কি হইয়াছে যে, পথে-ঘাটে কোথাও বিশেষ একটা বয়সের কোন মেয়ে দেখিলেই তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, হাজার চেষ্টা করিয়াও সে যেন কোন মতে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারে না। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ, হয়ত অত্যন্ত লজ্জা করিয়া, সমস্ত দেহ বারংবার শিহরিয়া উঠে, সে তৎক্ষণাৎ যে কোনও একটা পথ ধরিয়া দ্রুতপদে সরিয়া যায়।

সত্য সাঁতার কাটিয়া স্নান করিতে ভালবাসিত। তাহার চোরবাগানের বাসা হইতে গঙ্গা দূর নয়, প্রায়ই সে জগন্নাথ-ঘাটে স্নান করিতে আসিত।

আজ পূর্ণিমা। ঘাটে একটু ভিড় হইয়াছিল। গঙ্গায়

আসিলে সে যে উৎকলী ব্রাহ্মণের কাছে শুষ্ক বস্ত্র জিম্মা রাখিয়া জলে নামিত তাহারই উদ্দেশ্যে আসিতে গিয়া, এক স্থানে বাধা পাইয়া, স্থির হইয়া দেখিল, চার-পাঁচজন লোক একদিকে চাহিয়া আছে। সত্য তাহাদের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিতে গিয়া, বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

তাহার মনে হইল, একসঙ্গে এত রূপ সে আর কখনও নারীদেহে দেখে নাই। মেয়েটির বয়স আঠার-উনিশের বেশী নয়। পরণে সাদাসিধা কালপেড়ে শাড়ী, দেহ সম্পূর্ণ অলঙ্কার বর্জ্জিত, হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কপালে চন্দনের ছাপ লইতেছে, এবং তাহারই পরিচিত পাণ্ডা এক মনে সুন্দরীর কপালে নাকে আঁক কাটিয়া দিতেছে।

সত্য কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পাণ্ডা সত্যর কাছে যথেষ্ট প্রণামী পাইত, তাই রূপসীর চাঁদ-মুখের খাতির ত্যাগ করিয়া, হাতের ছাঁচ ফেলিয়া দিয়া 'বড়বাবু'র শুষ্ক বস্ত্রের জন্য হাত বাড়াইল।

দুজনের চোখাচোখি হইল। সত্য তাড়াতাড়ি কাপড়খানা পাণ্ডার হাতে দিয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া জলে গিয়া নামিল। আজ তাহার সাঁতার কাটা হইল না, কোনমতে স্নান সারিয়া লইয়া, যখন সে বস্ত্র পরিবর্ত্তনের জন্য উপরে উঠিল, তখন সেই অসামান্যা রূপসী চলিয়া গিয়াছে।

সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার মন গঙ্গা গঙ্গা করিতে লাগিল, এবং পরদিন ভাল করিয়া সকাল না হইতেই মা গঙ্গা এমনি সজোরে টান দিলেন যে, সে বিলম্ব না করিয়া,

আল্‌না হইতে একখানি বস্ত্র টানিয়া লইয়া গঙ্গা যাত্রা করিল।

ঘাটে আসিয়া দেখিল, অপরিচিতা রূপসী এইমাত্র স্নান সারিয়া উপরে উঠিতেছে। সত্য নিজেও যখন স্নানান্তে পাণ্ডার কাছে আসিল, তখন পূর্ব্বদিনের মত আজও সে ললাট চিত্রিত করিতেছিল। আজও চারি চক্ষু মিলিল, আজও তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ বহিয়া গেল, সে কোন মতে কাপড় ছাড়িয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

৩

রমণী যে প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতে আসে, সত্য তাহা বুঝিয়া লইয়াছিল। এতদিন যে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে নাই, তাহার একমাত্র হেতু—পূর্ব্বে সত্য নিজে কতকটা বেলা করিয়া স্নানে আসিত।

জাহ্নবী তটে উপর্য্যুপরি আজ সাত দিন উভয়ের চারি চক্ষু মিলিয়াছে, কিন্তু মুখের কথা হয় নাই। বোধ করি তার প্রয়োজন ছিল না। কারণ যেখানে চাহনিতে কথা হয়, সেখানে মুখের কথাকে মূক হইয়া থাকিতে হয়। এই অপরিচিতা রূপসী যেই হোক সে যে চোখ দিয়া কথা কহিতে শিক্ষা করিয়াছে, এবং সে-বিদ্যায় পারদর্শী, সত্যর অন্তর্যামী তাহা নিভৃত অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে পারিয়াছিল।

সেদিন স্নান করিয়া সে কতকটা অন্যমনস্কের মত বাসায়

ফিরিতেছিল, হঠাৎ তাহার কানে গেল, 'একবার শুনুন!' মুখ তুলিয়া দেখিল, রেলওয়ে লাইনের ওপারে সেই রমণী দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বাম কক্ষে জলপূর্ণ ক্ষুদ্র পিত্তলের কলস, দক্ষিণ হস্তে সিক্ত বস্ত্র। মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে আহ্বান করিল। সত্য এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া কাছে গিয়া দাঁড়াইল, সে উৎসুক চক্ষে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, আমার ঝি আজ আসেনি, দয়া ক'রে একটু যদি এগিয়ে দেন ত বড় ভাল হয়।

অন্যদিন সে দাসী সঙ্গে করিয়া আসে, আজ একা। সত্যর মনের মধ্যে দ্বিধা জাগিল, কাজটা ভাল নয় বলিয়া একবার মনেও হইল, কিন্তু সে 'না' বলিতেও পারিল না। রমণী তাহার মনের ভাব অনুমান করিয়া একটু হাসিল। এ হাসি যাহারা হাসিতে জানে, সংসারে তাহাদের অপ্রাপ্য কিছুই নাই। সত্য তৎক্ষণাৎ 'চলুন' বলিয়া উহার অনুসরণ করিল। দুই-চারি পা অগ্রসর হইয়া রমণী আবার কথা কহিল, ঝির অসুখ, সে আস্‌তে পার্‌লে না, কিন্তু আমিও গঙ্গাস্নান না ক'রে থাক্‌তে পারিনে—আপনারও দেখ্‌চি এ বদ্ অভ্যাস আছে।

সত্য আস্তে আস্তে জবাব দিল, আজ্ঞে হাঁ, আমিও প্রায় গঙ্গাস্নান করি।

এখানে কোথায় আপনি থাকেন?

চোরবাগানে আমার বাসা।

আমাদের বাড়ী জোড়াসাঁকোয়। আপনি আমাকে পাথুরেঘাটার মোড় পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বড় রাস্তা হয়ে যাবেন।

তাই হবে।

বহুক্ষণ আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। চিৎপুর রাস্তায় আসিয়া রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আবার সেই হাসি হাসিয়া বলিল, কাছেই আমাদের বাড়ী—এবার যেতে পার্‌ব—নমস্কার।

নমস্কার, বলিয়া সত্য ঘাড় গুঁজিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার বুকের মধ্যে যে কি করিতে লাগিল, সে কথা লিখিয়া জানানো অসাধ্য। যৌবনে পঞ্চশরের প্রথম পুষ্পবাণের আঘাত যাঁহাকে সহিতে হইয়াছে, শুধু তাঁহারই মনে পড়িবে, শুধু তিনিই বুঝিবেন, সেদিন কি হইয়াছিল; সবাই বুঝিবে না, কি উন্মাদ নেশায় মাতিলে জল-স্থল, আকাশ-বাতাস সব রাঙা দেখায়, সমস্ত চৈতন্য কি করিয়া চেতনা হারাইয়া, একখণ্ড প্রাণহীন চুম্বক-শলাকার মত শুধু এই একদিকে ঝুঁকিয়া পড়িবার জন্যই অনুক্ষণ উন্মুখ হইয়া থাকে।

পরদিন সকালে সত্য জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, রোদ উঠিয়াছে। একটা ব্যথার তরঙ্গ তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া গড়াইয়া গেল, সে নিশ্চিত বুঝিল, আজিকার দিনটা একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। চাকরটা সুমুখ দিয়া যাইতেছিল, তাহাকে ভয়ানক ধমক দিয়া কহিল, হারামজাদা, এত বেলা হয়েছে, তুলে দিতে পারিস্‌নি? যা তোর এক টাকা জরিমানা।

সে বেচারা হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল; সত্য দ্বিতীয় বস্ত্র না লইয়াই রুষ্ট-মুখে বাসা হইতে বাহির হইয়া গেল।

পথে আসিয়া গাড়ী ভাড়া করিল এবং গাড়োয়ানকে পাথুরেঘাটার ভিতর দিয়া হাঁকাইতে হুকুম করিয়া, রাস্তার দুই দিকেই প্রাণপণে চোখ পাতিয়া রাখিল; কিন্তু গঙ্গায় আসিয়া, ঘাটের দিকে চাহিতেই তাহার সমস্ত ক্ষোভ যেন জুড়াইয়া গেল, বরঞ্চ মনে হইল, যেন অকস্মাৎ পথের উপরে নিক্ষিপ্ত একটা অমূল্য রত্ন কুড়াইয়া পাইল।

গাড়ী হইতে নামিতেই সে মৃদু হাসিয়া নিতান্ত পরিচিতের মত বলিল, এত দেরী যে? আমি আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি—শীগ্‌গির নেয়ে নিন্, আজও আমার ঝি আসেনি।

এক মিনিট সবুর করুন, বলিয়া সত্য দ্রুতপদে জলে গিয়া নামিল। সাঁতার কাটা তাহার কোথায় গেল! সে কোন মতে গোটা দুই-তিন ডুব দিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, আমার গাড়ী গেল কোথায়?

রমণী কহিল, আমি তাকে ভাড়া দিয়ে বিদেয় করেচি।

আপনি ভাড়া দিলেন!

দিলামই বা। চলুন। বলিয়া আর একবার ভুবনমোহিনী হাসি হাসিয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইল।

সত্য একেবারেই মরিয়াছিল, না হইলে যত নিরীহ, যত অনভিজ্ঞই হোক, একবারও সন্দেহ হইত—এ সব কি!

পথ চলিতে চলিতে রমণী কহিল, কোথায় বাসা বল্‌লেন, চোরবাগানে?

সত্য কহিল, হাঁ।

সেখানে কি কেবল চোরেরাই থাকে ?

সত্য আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কেন ?

আপনি ত চোরের রাজা। বলিয়া রমণী ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া কটাক্ষে হাসিয়া, আবার নির্ব্বাক মরাল-গমনে চলিতে লাগিল। আজ কক্ষের ঘট অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিল, ভিতরে গঙ্গাজল ছলাৎ-ছল, ছলাৎ-ছল শব্দে—অর্থাৎ, ওরে মুগ্ধ—ওরে অন্ধ যুবক ! সাবধান ! এ সব ছলনা—সব ফাঁকি, বলিয়া উছলিয়া উছলিয়া একবার ব্যঙ্গ, একবার তিরস্কার করিতে লাগিল।

মোড়ের কাছাকাছি আসিয়া সত্য সসঙ্কোচে কহিল, গাড়ী-ভাড়াটা—

রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অস্ফুট মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, সে ত আপনার দেওয়াই হয়েছে।

সত্য এই ইঙ্গিত না বুঝিয়া প্রশ্ন করিল, আমার দেওয়া কি ক'রে ?

আমার আর আছে কি যে দেব ! যা ছিল সমস্তই ত তুমি চুরি-ডাকাতি ক'রে নিয়েচ। বলিয়াই সে চকিতে মুখ ফিরাইয়া, বোধ করি, উচ্ছ্বসিত হাসির বেগ জোর করিয়া রোধ করিতে লাগিল।

এ অভিনয় সত্য দেখিতে পায় নাই, তাই এই চুরির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তীব্র তড়িৎ-রেখার মত তাহার সংশয়ের জাল আপ্রান্ত বিদীর্ণ করিয়া বুকের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া ফেলিল। তাহার মুহূর্ত্তে সাধ হইল, এই প্রকাশ্য রাজপথেই ওই দুটি রাঙা

পায়ে লুটাইয়া পড়ে, কিন্তু চক্ষের নিমিষে, গভীর লজ্জায়, তাহার মাথা এম্‌নি হেঁট হইয়া গেল যে, সে মুখ তুলিয়া একবার প্রিয়তমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেও পারিল না, নিঃশব্দে নতমুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ও ফুটপাথে তাহার আদেশমত দাসী অপেক্ষা করিতেছিল, কাছে আসিয়া কহিল, আচ্ছা দিদিমণি, বাবুটিকে এমন ক'রে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চ কেন? বলি, কিছু আছে-টাছে? দুপয়সা টান্‌তে পার্‌বে ত?

রমণী হাসিয়া বলিল, তা জানি নে, কিন্তু হাবা-গোবা লোকগুলোকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরোতে আমার বেশ লাগে।

দাসীটিও খুব খানিকটা হাসিয়া বলিল, এতও পার তুমি। কিন্তু যাই বল দিদিমণি, দেখ্‌তে যেন রাজপুত্তুর! যেমন চোখ, মুখ, তেমনি রঙ। তোমাদের দুটিকে দিব্যি মানায়— দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছিলে যেন একটি জোড়া গোলাপ ফুটে ছিল?

রমণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, আচ্ছা চল্। পছন্দ হ'য়ে থাকে ত না হয় তুই নিস্।

দাসীও হটিবার পাত্রী নয়, সেও জবাব দিল, না দিদিমণি, ও জিনিস প্রাণ ধ'রে কাউকে দিতে পার্‌বে না, তা ব'লে দিলুম।

জ্ঞানীরা কহিয়াছেন, অসম্ভব কাণ্ড চোখে দেখিলেও বলিবে না, কারণ অজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে না। এই অপরাধেই শ্রীমন্ত বেচারা নাকি মশানে গিয়াছিল। সে যাই হোক্, ইহা অতি সত্যকথা যে, সত্য লোকটা সেদিন বাসায় ফিরিয়া টেনিসন্ পড়িয়াছিল এবং ডন্‌জুয়ানের বাঙলা তর্জ্জমা করিতে বসিয়াছিল। অতবড় ছেলে, কিন্তু একবারও এ সংশয়ের কণামাত্রও তাহার মনে উঠে নাই যে, দিনের বেলা, সহরের পথে ঘাটে এমন অদ্ভুত প্রেমের বান ডাকা সম্ভব কি না, কিংবা সে-বানের স্রোতে গা ভাসাইয়া চলা নিরাপদ কি না!

দিন-দুই পরে স্নানান্তে বাটী ফিরিবার পথে, অপরিচিতা সহসা কহিল, কাল রাত্রে থিয়েটার দেখ্‌তে গিয়েছিলুম, সরলার কষ্ট দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়—না?

সত্য সরলা প্লে দেখে নাই, স্বর্ণলতা বই পড়িয়াছিল, আস্তে আস্তে বলিল, হাঁ, বড় দুঃখ পেয়েই মারা গেল।

রমণী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, উঃ, কি ভয়ানক কষ্ট। আচ্ছা, সরলাই বা তার স্বামীকে এত ভালবাস্‌লে কি ক'রে, আর তার বড়জা-ই বা পারেনি কেন বল্‌তে পার?

সত্য সংক্ষেপে জবাব দিল, স্বভাব।

রমণী কহিল, ঠিক তাই! বিয়ে ত সকলেরই হয়, কিন্তু সব স্ত্রী-পুরুষই কি পরস্পরকে সমান ভালবাস্‌তে পারে? পারে না। কত লোক আছে, মরবার দিনটি পর্য্যন্ত ভালবাসা

কি, জান্‌তেও পায় না। জান্‌বার ক্ষমতাই তাদের থাকে না। দেখনি, কত লোক গান-বাজনা হাজার ভাল হ'লেও মন দিয়ে শুন্‌তে পারে না, কত লোক কিছুতেই রাগে না—রাগ্‌তেই পারে না! লোকে তাদের খুব গুণ গায় বটে, আমার কিন্তু নিন্দে কর্‌তে ইচ্ছে করে!

সত্য হাসিয়া বলিল, কেন?

রমণী উদ্দীপ্তকণ্ঠে উত্তর করিল, তারা অক্ষম ব'লে। অক্ষমতার কিছু কিছু গুণ থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু দোষটাই বেশী। এই যেমন সরলার ভাশুর—স্ত্রীর অতবড় অত্যাচারেও তার রাগ হ'ল না।

সত্য চুপ করিয়া রহিল, সে পুনরায় কহিল, আর তার স্ত্রী, ঐ প্রমদাটা কি সয়তান মেয়েমানুষ! আমি থাক্‌তুম ত রাক্ষুসীর গলা টিপে দিতুম।

সত্য সহাস্যে কহিল, থাক্‌তে কি ক'রে? প্রমদা ব'লে সত্যিই ত কেউ ছিল না—কবির কল্পনা—

রমণী বাধা দিয়া কহিল, তবে অমন কল্পনা করা কেন? আচ্ছা, সবাই বলে, সমস্ত মানুষের ভিতরই ভগবান আছেন, আত্মা আছেন, কিন্তু প্রমদার চরিত্র দেখলে মনে হয় না, যে, তার ভেতরেও ভগবান ছিলেন। সত্যি বল্‌চি তোমাকে, কোথায় বড় বড় লোকের বই প'ড়ে মানুষ ভাল হবে, মানুষকে মানুষ ভালবাসবে, তা না, এমন বই লিখে দিলেন যে, পড়লে মানুষের ওপর মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়—বিশ্বাস হয়, না যে, সত্যিই সব মানুষের অন্তরেই ভগবানের মন্দির আছে।

সত্য বিস্মিত হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, তুমি বুঝি খুব বই পড় ?

রমণী কহিল, ইংরাজি জানিনে ত, বাংলা বই যা বেরোয় সব পড়ি। এক একদিন সারা রাত্রি পড়ি—এই যে বড় রাস্তা—চল না আমাদের বাড়ী, যত বই আছে, সব দেখাব।

সত্য চমকিয়া উঠিল—তোমাদের বাড়ী ?

হাঁ, আমাদের বাড়ী—চল, যেতে হবে তোমাকে।

হঠাৎ সত্যর মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, সে সভয়ে বলিয়া উঠিল, না না, ছি ছি—

ছি ছি কিছু নেই—চল।

না না, আজ না—আজ থাক্, বলিয়া সত্য কম্পিত দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। এই অপরিচিতা প্রেমাস্পদার উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধার ভারে আজ তাহার হৃদয় অবনত হইয়া রহিল।

৫

সকাল-বেলা স্নান করিয়া সত্য ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিয়াছিল। তাহার দৃষ্টি ক্লান্ত, সজল। চোখের পাতা তখনও আর্দ্র। আজ চার দিন গত হইয়াছে, সেই অপরিচিতা প্রিয়তমাকে সে দেখিতে পায় নাই—আর সে গঙ্গাস্নানে আসে না।

আকাশ-পাতাল কত কি যে এই কয়দিন সে ভাবিয়াছে, তাহার সীমা নাই। মাঝে মাঝে এ দুশ্চিন্তাও মনে উঠিয়াছে, হয়ত তিনি বাঁচিয়াই নাই—হয়ত বা মৃত্যুশয্যায়! কে জানে!

সে গলিটা জানে বটে, কিন্তু আর কিছু চেনে না। কাহার বাড়ী, কোথায় বাড়ী, কিছুই জানে না। মনে করিলে, অনুশোচনায়, আত্মগ্লানিতে হৃদয় দগ্ধ হইয়া যায়। কেন সে সেদিন যায় নাই, কেন সে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াছিল!

সে যথার্থ-ই ভালবাসিয়াছিল। চোখের নেশা নহে, হৃদয়ের গভীর তৃষ্ণা। ইহাতে ছলনা-কাপট্যের ছায়ামাত্র ছিল না, যাহা ছিল—তাহা সতই নিঃস্বার্থ, সত্যই পবিত্র, বুকজোড়া স্নেহ।

বাবু!

সত্য চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, তাঁহার সেই দাসী যে সঙ্গে আসিত, পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছে।

সত্য ব্যস্ত হইয়া কাছে আসিয়া ভারী গলায় কহিল, কি হয়েছে তাঁর? বলিয়াই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল—সামলাইতে পারিল না। দাসী মুখ নীচু করিয়া হাসি গোপন করিল, বোধ করি হাসিয়া ফেলিবার ভয়েই মুখ নীচু করিয়াই বলিল, দিদিমণির বড় অসুখ, আপনাকে দেখতে চাইচেন।

চল, বলিয়া সত্য তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়া চোখ মুছিয়া সঙ্গে চলিল। চলিতে চলিতে প্রশ্ন করিল, কি অসুখ? খুব শক্ত দাঁড়িয়েছে কি?

দাসী কহিল, না, তা হয়নি, কিন্তু খুব জ্বর।

সত্য মনে মনে হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল আর প্রশ্ন করিল না। বাড়ীর সুমুখে আসিয়া দেখিল, খুব বড় বাড়ী দ্বারের কাছে বসিয়া একজন হিন্দুস্থানী দারোয়ান ঝিমাইতেছে,

দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি গেলে তোমার দিদিমণির বাবা রাগ করবেন না ত? তিনি ত আমাকে চেনেন না।

দাসী কহিল, দিদিমণির বাপ নেই, শুধু মা আছেন। দিদিমণির মত তিনিও আপনাকে খুব ভালবাসেন।

সত্য আর কিছু না বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

সিঁড়ি বাহিয়া তেতলার বারান্দায় আসিয়া দেখিল, পাশাপাশি তিনটি ঘর, বাহির হইতে যতটুকু দেখা যায় মনে হইল সেগুলি চমৎকার সাজানো। কোণের ঘর হইতে উচ্চহাসির সঙ্গে তবলা ও ঘুঙুরের শব্দ আসিতেছিল, দাসী হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল, ঐ ঘর—চলুন। দ্বারের সুমুখে আসিয়া সে হাত দিয়া পর্দ্দা সরাইয়া দিয়া সু-উচ্চ কণ্ঠে বলিল, দিদিমণি এই নাও তোমার নাগর!

তীব্র হাসি ও কোলাহল উঠিল। ভিতরে যাহা দেখিল, তাহাতে সত্যর সমস্ত মস্তিষ্ক উলট-পালট হইয়া গেল, তাহার মনে হইল, হঠাৎ সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে, কোন মতে দোর ধরিয়া, সে সেইখানেই চোখ বুজিয়া চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল।

ঘরের ভিতরে মেঝেয় মোটা গদি-পাতা বিছানার উপর দু-তিন জন ভদ্রবেশী পুরুষ। একজন হারমোনিয়ম একজন বাঁয়া-তবলা লইয়া বসিয়া আছে—আর একজন একমনে মদ খাইতেছে। আর তিনি? তিনি বোধ করি এইমাত্র নৃত্য করিতেছিলেন! দুই পায়ে একরাশ ঘুঙুর বাঁধা নানা অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত—সুরারঞ্জিত চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু

করিতেছে ত্বরিতপদে কাছে সরিয়া আসিয়া সত্যর একটা হাত ধরিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, বঁধুর মির্‌গি ব্যামো আছে নাকি? নে ভাই, ইয়ারকি করিস্‌নে, ওঠ্—ওসবে আমার ভারি ভয় করে।

প্রবল তড়িৎ স্পর্শে হতচেতন মানুষ যেমন করিয়া কাঁপিয়া নড়িয়া উঠে, উহার করস্পর্শে সত্যর আপাদমস্তক তেমনি করিয়া কাঁপিয়া নড়িয়া উঠিল।

রমণী কহিল আমার নাম শ্রীমতী বিজ্‌লী—তোমার নামটা কি ভাই? হাবু? গাবু?

সমস্ত লোকগুলো হো হো শব্দে অট্টহাসি জুড়িয়া দিল, দিদিমণির দাসীটি হাসির চোটে একেবারে মেঝের উপর গড়াইয়া শুইয়া পড়িল—কি রঙ্গই জান দিদিমণি!

বিজ্‌লী কৃত্রিম রোষের স্বরে তাহাকে একটা ধমক দিয়া বলিল, থাম্, বাড়াবাড়ি করিস্‌নে—আসুন, উঠে আসুন, বলিয়া জোর করিয়া সত্যকে টানিয়া আনিয়া একটা চৌকির উপর বসাইয়া দিয়া, পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, হাত জোড় করিয়া সুরু করিয়া দিল—

আজু রজনী হম ভাগে পোহায়নু
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি' মানলুঁ
দশ-দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ, গেহ করি' মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।

আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা ॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ-বাণ অব লাখ-বাণ হোউ
মলয়-পবন বহু মন্দা ॥
অব মঝু যবহুঁ, পিয়া-সঙ্গ হোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা—

যে লোকটা মদ খাইতেছিল, উঠিয়া আসিয়া পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল। তাহার নেশা হইয়াছিল, কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, ঠাকুরমশাই! বড় পাতকী আমি—একটু পদরেণু—অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ সত্য স্নান করিয়া একখানা গরদের কাপড় পরিয়াছিল।

যে লোকটা হারমোনিয়ম বাজাইতেছিল, তাহার কতকটা কাণ্ডজ্ঞান ছিল, সে সহানুভূতির স্বরে কহিল, কেন বেচারাকে মিছামিছি সঙ্ সাজাচ্চ?

বিজ্‌লী হাসিতে হাসিতে বলিল, বাঃ মিছামিছি কিসে? ও সত্যিকারের সঙ্ ব'লেই ত এমন আমোদের দিনে ঘরে এনে তোমাদের তামাসা দেখাচ্চি। আচ্ছা, মাথা খাস্ গাবু, সত্যি বল্ ত ভাই, কি আমাকে তুই ভেবেছিলি? নিত্য গঙ্গাস্নানে যাই, কাজেই ব্রাহ্মও নই, মোচলমান, খ্রীষ্টানও নই। হিঁদুর ঘরের এত বড় ধাড়ী মেয়ে, হয় সধবা নয় বিধবা—কি মতলবে

ছুটিয়ে পীরিত কর্‌ছিলি বল্‌ ত ? বিয়ে কর্‌বি ব'লে, না ভুলিয়ে নিয়ে লম্বা দিবি ব'লে ?

ভারি একটা হাসি উঠিল। তারপর সকলে মিলিয়া কত কথাই বলিতে লাগিল ; সত্য একটিবার মুখ তুলিল না, একটা কথার জবাব দিল না। সে মনে কি ভাবিতেছিল, তাহা বলিবই বা কি করিয়া, আর বলিলে বুঝিবেই বা কে ! থাক্‌ সে !

বিজ্‌লী সহসা চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বাঃ, বেশ ত আমি ! যা ক্ষ্যামা, শীগ্‌গির যা—বাবুর খাবার নিয়ে আয় ; স্নান ক'রে এসেচেন—বাঃ, আমি কেবল তামাসাই কচ্চি যে ! বলিতে বলিতেই তাহার অনতিকাল পূর্ব্বের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-বহ্ন্যুত্তপ্ত কণ্ঠস্বর অকৃত্রিম সস্নেহ অনুতাপে যথার্থ-ই জুড়াইয়া গেল।

খানিক পরে দাসী একথালা খাবার আনিয়া হাজির করিল। বিজ্‌লী নিজের হাতে লইয়া আবার হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিল, মুখ তোল, খাও।

এতক্ষণ সত্য তাহার সমস্ত শক্তি এক করিয়া নিজেকে সামলাইতেছিল, এইবার মুখ তুলিয়া শান্তভাবে বলিল, আমি খাব না।

কেন ? জাত যাবে ? আমি হাড়ি না মুচি ?

সত্য তেমনি শান্তকণ্ঠে বলিল, তা হ'লে খেতুম। আপনি যা তাই।

বিজ্‌লী খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া বলিল, হাবুবাবুও ছুরি-ছোরা চালাতে জানেন দেখচি ! বলিয়া আবার হাসিল, কিন্তু

তাহা শব্দমাত্র, হাসি নয়, তাই আর কেহ সে হাসিতে যোগ দিতে পারিল না।

সত্য কহিল, আমার নাম সত্য, হাবু নয়। আমি ছুরি-ছোরা চালাতে কখন শিখিনি, কিন্তু, নিজের ভুল টের পেলে শোধ্‌রাতে শিখেচি।

বিজ্‌লী হঠাৎ কি কথা বলিতে গেল, কিন্তু চাপিয়া লইয়া শেষে কহিল, আমার ছোঁয়া খাবে না ?

না।

বিজ্‌লী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরিহাসের স্বরে এবার তীব্রতা মিশিল, জোর দিয়া কহিল, খাবেই। এই বল্‌চি তোমাকে, আজ না হয় কাল, না হয় দুদিন পরে খাবেই তুমি।

সত্য ঘাড় নাড়িয়া বলিল, দেখুন, ভুল সকলেরই হয়। আমার ভুল যে কত বড়, তা সবাই টের পেয়েচে ; কিন্তু আপনারও ভুল হচ্চে। আজ নয়, কাল নয়, দুদিন পরে নয়, এ জন্মে নয়, আগামী জন্মেও নয়—কোন কালেই আপনার ছোঁয়া খাব না। অনুমতি করুন, আমি যাই—আপনার নিশ্বাসে আমার রক্ত শুকিয়ে যাচ্চে।

তাহার মুখের উপর গভীর ঘৃণার এম্‌নি সুস্পষ্ট ছায়া পড়িল যে, তাহা ঐ মাতালটার চক্ষুও এড়াইল না। সে মাথা নাড়িয়া কহিল, বিজ্‌লীবিবি, অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্‌। যেতে দাও—যেতে দাও—সকাল-বেলার আমোদটাই ও মাটি ক'রে দিলে !

বিজ্‌লী জবাব দিল না, স্তম্ভিত হইয়া সত্যর মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যথার্থ-ই তাহার ভয়ানক ভুল হইয়াছিল।

সে যে কল্পনাও করে নাই, এমন মুখচোরা শান্ত লোক এমন করিয়া বলিতে পারে।

সত্য আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজ্‌লী মৃদু স্বরে কহিল, আর একটু বোসো।

মাতাল শুনিতে পাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, উ হুঁ হুঁ, প্রথম চোটে একটু জোর খেল্‌বে—যেতে দাও—যেতে দাও—সূতো ছাড়ো—সূতো ছাড়ো—

সত্য ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িল, বিজ্‌লী পিছনে আসিয়া পথরোধ করিয়া চুপি চুপি বলিল, ওরা দেখতে পাবে, তাই—নইলে হাতজোড় করে বল্‌তুম, আমার বড় অপরাধ হয়েছে—

সত্য অন্যদিকে মুখ করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সে পুনর্ব্বার কহিল, এই পাশের ঘরটা আমার পাড়ার ঘর। একবার দেখবে না? একটিবার এসো, মাপ চাচ্চি।

না, বলিয়া সত্য সিঁড়ি অভিমুখে অগ্রসর হইল। বিজ্‌লী পিছনে পিছনে চলিতে চলিতে কহিল, কাল দেখা হবে?

না।

আর কি কখনো দেখা হবে না?

না।

কান্নায় বিজ্‌লীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, ঢোঁক গিলিয়া জোর করিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল, আমার বিশ্বাস হয় না, আর দেখা হবে না; কিন্তু, তাও যদি না হয়, বল, এই কথাটা আমার বিশ্বাস কর্‌বে?

ভগ্নস্বর শুনিয়া সত্য বিস্মিত হইল, কিন্তু এই পনর-ষোল দিন ধরিয়া যে অভিনয় সে দেখিয়াছে, তাহার কাছে ত ইহা কিছুই নয়। তথাপি সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। সে মুখের রেখায় রেখায় সুদৃঢ় অপ্রত্যয় পাঠ করিয়া বিজ্‌লীর বুক ভাঙিয়া গেল ; কিন্তু, সে করিবে কি ? হায় হায় ! প্রত্যয় করাইবার সমস্ত উপায়ই সে যে আবর্জ্জনার মত স্বহস্তে ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া দিয়াছে।

সত্য প্রশ্ন করিল, কি বিশ্বাস কর্‌ব ?

বিজ্‌লীর ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু স্বর ফুটিল না। অশ্রুভারাক্রান্ত দুই চোখ মুহূর্ত্তের জন্য তুলিয়াই অবনত করিল। সত্য তাহাও দেখিল, কিন্তু অশ্রুর কি নকল নাই ! বিজ্‌লী মুখ না তুলিয়াও বুঝিল, সত্য অপেক্ষা করিয়া আছে ; কিন্তু সেই কথাটা যে মুখ দিয়া সে কিছুতেই বাহির করিতে পারিতেছে না, যাহা বাহিরে আসিবার জন্য তাহার বুকের পাঁজরাগুলো ভাঙিয়া গুঁড়াইয়া দিতেছে।

সে ভালবাসিয়াছে। যে ভালবাসার একটা কথা সার্থক করিবার লোভে, সে এই রূপের ভাণ্ডার দেহটাও হয়ত একখণ্ড গলিত বস্ত্রের মতই ত্যাগ করিতে পারে—কিন্তু কে তাহা বিশ্বাস করিবে ! সে যে দাগী আসামী ! অপরাধের শত কোটি চিহ্ন সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া বিচারকের সুমুখে দাঁড়াইয়া, আজ কি করিয়া সে মুখে আনিবে, অপরাধ করাই তাহার পেশা বটে, কিন্তু এবার সে নির্দ্দোষ ! যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, ততই সে বুঝিতে লাগিল, বিচারক তাহার ফাঁসির হুকুম দিতে বসিয়াছে,

কিন্তু কি করিয়া সে রোধ করিবে? সত্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল; সে বলিল, চল্লুম।

বিজ্‌লী তবুও মুখ তুলিতে পারিল না, কিন্তু এবার কথা কহিল। বলিল, যাও, কিন্তু যে কথা অপরাধে মগ্ন থেকেও আমি বিশ্বাস করি, সে কথা অবিশ্বাস ক'রে যেন তুমি অপরাধী হ'য়ো না। বিশ্বাস কর, সকলের দেহতেই ভগবান বাস করেন এবং আমরণ দেহটাকে তিনি ছেড়ে চলে যান না! একটু থামিয়া কহিল, সব মন্দিরেই দেবতার পূজা হয় না বটে, তবুও তিনি দেবতা! তাঁকে দেখে মাথা নোয়াতে না পার, কিন্তু তাঁকে মাড়িয়ে যেতেও পার না। বলিয়াই পদশব্দে মুখ তুলিয়া দেখিল, সত্য ধীরে ধীরে নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছে।

স্বভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে ত উড়াইয়া দেওয়া যায় না। নারীদেহের উপর শত অত্যাচার চলিতে পারে, কিন্তু নারীত্বকে ত অস্বীকার করা চলে না। বিজ্‌লী নর্ত্তকী, তথাপি সে যে নারী! আজীবন সহস্র অপরাধে অপরাধী, তবুও যে এটা তাহার নারীদেহ! ঘণ্টা-খানেক পরে যখন সে ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার লাঞ্ছিত অর্দ্ধমৃত নারী প্রকৃতি অমৃতস্পর্শে জাগিয়া বসিয়াছে। এই অত্যল্প সময়টুকুর মধ্যে তাহার সমস্ত দেহে কি যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা ঐ মাতালটা পর্য্যন্ত টের পাইল। সে-ই মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিল—কি বাইজী, চোখের পাতা

ভিজে যে! মাইরি, ছোঁড়াটা কি একগুঁয়ে, অমন জিনিসগুলো মুখে দিলে না। দাও দাও, থালাটা এগিয়ে দাও ত হ্যা—বলিয়া নিজেই টানিয়া লইয়া গিলিতে লাগিল।

তাহার একটা কথাও বিজ্‌লীর কানে গেল না। হঠাৎ তাহার নিজের পায়ে নজর পড়ায় পায়ে বাঁধা ঘুঙুরের তোড়া যেন বিছার মত তাহার দু পা বেড়িয়া দাঁত ফুটাইয়া দিল, সে তাড়াতাড়ি সেগুলো খুলিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, খুল্‌লে যে?

বিজ্‌লী মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, আর পর্‌ব না ব'লে।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ আর না! বাইজী মরেছে—

মাতাল সন্দেশ চিবাইতেছিল। কহিল, কি রোগে বাইজী?

বাইজী আবার হাসিল। এ সেই হাসি। হাসিমুখে কহিল, যে রোগে আলো জ্বাল্‌লে আঁধার মরে, সূয্যি উঠলে রাত্রি মরে—আজ সেই রোগেই তোমাদের বাইজী চিরদিনের জন্য ম'রে গেল বন্ধু!

৬

চার বৎসর পরের কথা বলিতেছি। কলিকাতার একটা বড় বাড়ীতে জমিদারের ছেলের অন্নপ্রাশন। খাওয়ানো-দাওয়ানোর বিরাট ব্যাপার শেষ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পর বহির্বাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আসর করিয়া আমোদ-আহ্লাদ, নাচ-গানের উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে।

একধারে তিন-চারিটি নর্ত্তকী—ইহারাই নাচ-গান করিবে। দ্বিতলের বারান্দায়, চিকের আড়ালে বসিয়া রাধারাণী একাকী নীচের জনসমাগম দেখিতেছিল। নিমন্ত্রিতা মহিলারা এখন শুভাগমন করেন নাই।

নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া সত্যেন্দ্র কহিল, এত মন দিয়ে কি দেখ্‌চ বল ত?

রাধারাণী স্বামীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া হাসিমুখে বলিল, যা সবাই দেখতে আস্‌চে—বাইজীদের সাজ-সজ্জা—কিন্তু, হঠাৎ তুমি যে এখানে?

স্বামী হাসিয়া জবাব দিল, একলাটি ব'সে আছ তাই একটু গল্প করতে এলুম।

ইস্‌!

সত্যি। আচ্ছা দেখ্‌চ ত বল দেখি, ওদের মধ্যে সবচেয়ে কোন্‌টিকে তোমার পছন্দ হয়?

ঐটিকে, বলিয়া রাধারাণী আঙুল তুলিয়া, যে স্ত্রীলোকটি

সকলের পিছনে নিতান্ত সাদাসিধা পোষাকে বসিয়াছিল, তাহাকেই দেখাইয়া দিল।

স্বামী বলিল, ও যে নেহাৎ রোগা।

তা হোক্, ঐ সবচেয়ে সুন্দরী; কিন্তু, বেচারী গরীব—গায়ে গয়না-টয়না এদের মত নেই।

সত্যেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা হবে; কিন্তু, এদের মজুরী কত জান?

না।

সত্যেন্দ্র হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল, এদের দুজনের ত্রিশ টাকা ক'রে, ঐ ওর পঞ্চাশ, আর যেটিকে গরীব বল্‌চ, তার দু'শ টাকা।

রাধারাণী চমকিয়া উঠিল—দু'শ! কেন, ও কি খুব ভাল গান করে?

কানে শুনিনি কখনো। লোকে বলে চার-পাঁচ বছর আগে খুব ভালই গাইত—কিন্তু, এখন পার্‌বে কি না, বলা যায় না।

তবে অত টাকা দিয়ে আন্‌লে কেন?

তার কমে ও আসে না। এতেও আস্‌তে রাজী ছিল না, অনেক সাধাসাধি ক'রে আনা হয়েছে।

রাধারাণী অধিকতর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, টাকা দিয়ে সাধাসাধি কেন?

সত্যেন্দ্র নিকটে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিল, তার প্রথম কারণ, ও ব্যবসা ছেড়ে দিয়েচে। গুণ ওর যতই হোক্, এত টাকা সহজে কেউ দিতেও চায় না, ওকেও

আস্‌তে হয় না, এই ওর ফন্দি। দ্বিতীয় কারণ, আমার নিজের গরজ।

কথাটা রাধারাণী বিশ্বাস করিল না। তথাপি আগ্রহে ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিল, তোমার গরজ ছাই; কিন্তু, ব্যবসা ছেড়ে দিলে কেন?

শুন্‌বে?

হাঁ, বল।

সত্যেন্দ্র একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিল, ওর নাম বিজ্‌লী। এক সময়ে—কিন্তু, এখানে লোক এসে পড়বে যে রাণি, ঘরে যাবে?

যাব, চল, বলিয়া রাধারাণী উঠিয়া দাঁড়াইল।

* * * *

স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া সমস্ত শুনিয়া রাধারাণী আঁচলে চোখ মুছিল। শেষে বলিল, তাই আজ ওঁকে অপমান ক'রে শোধ নেবে? এ বুদ্ধি কে তোমায় দিলে?

এদিকে সত্যেন্দ্রর নিজের চোখও শুষ্ক ছিল না, অনেকবার গলাটাও ধরিয়া আসিতেছিল। সে বলিল, অপমান বটে, কিন্তু সে অপমান আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ জান্‌তে পার্‌বে না! কেউ জান্‌বেও না।

রাধারাণী জবাব দিল না। আর একবার আঁচলে চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া গেল।

নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকে আসর ভরিয়া গিয়াছে এবং উপরে বারান্দায় বহু স্ত্রীকণ্ঠে সলজ্জ চীৎকার চিকের আবরণ ভেদ

করিয়া আসিতেছে। অন্যান্য নর্ত্তকীরা প্রস্তুত হইয়াছে, শুধু বিজ্‌লী তখনও মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছে। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে তাহার সঞ্চিত অর্থ প্রায় নিঃশেষ হইয়াছিল, তাই অভাবের তাড়নায় বাধ্য হইয়া আবার সেই কাজ অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছে যাহা সে শপথ করিয়া ত্যাগ করিয়াছিল; কিন্তু, সে মুখ তুলিয়া খাড়া হইতে পারিতেছিল না। অপরিচিত পুরুষের সতৃষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে দেহ যে এমন পাথরের মত ভারী হইয়া উঠিবে, পা এমন করিয়া তুমড়াইয়া ভাঙিয়া পড়িতে চাহিবে, তাহা সে ঘণ্টা-দুই পূর্ব্বে কল্পনা করিতেও পারে নাই।

আপনাকে ডাক্‌চেন।—বিজ্‌লী মুখ তুলিয়া দেখিল, পাশে দাঁড়াইয়া একটি বার-তের বছরের ছেলে। সে উপরের বারান্দা নির্দ্দেশ করিয়া পুনরায় কহিল, মা আপনাকে ডাক্‌চেন।

বিজ্‌লী বিশ্বাস করিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, কে ডাক্‌চেন?

মা ডাক্‌চেন।

তুমি কে?

আমি বাড়ীর চাকর।

বিজ্‌লী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আমাকে নয়, তুমি আবার জিজ্ঞাসা ক'রে এস।

বালক খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আপনার নাম বিজ্‌লী ত? আপনাকেই ডাক্‌চেন—আসুন আমার সঙ্গে, মা দাঁড়িয়ে আছেন।

চল, বলিয়া বিজ্‌লী তাড়াতাড়ি পায়ের ঘুঙুর খুলিয়া ফেলিয়া, তাহার অনুসরণ করিয়া অন্দরে আসিয়া প্রবেশ করিল। মনে করিল, গৃহিণীর বিশেষ কিছু ফরমায়েস আছে, তাই এই আহ্বান।

শোবার ঘরের দরজার কাছে রাধারাণী ছেলে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ত্রস্ত কুণ্ঠিত পদে বিজ্‌লী সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্রই সে সসম্ভ্রমে হাত ধরিয়া ভিতরে টানিয়া আনিল ; একটা চৌকির উপর জোর করিয়া বসাইয়া হাসিমুখে কহিল, দিদি, চিন্‌তে পার ?

বিজ্‌লী বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। রাধারাণী কোলের ছেলেকে দেখাইয়া বলিল, ছোটবোনকে না হয় নাই চিন্‌লে দিদি, সে দুঃখ করিনে ; কিন্তু এটাকে না চিন্‌তে পার্‌লে সত্যিই ঝগড়া করব ! বলিয়া মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

এমন হাসি দেখিয়াও বিজ্‌লী তথাপি কথা কহিতে পারিল না ; কিন্তু তাহার আঁধার আকাশ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হইয়া আসিতে লাগিল। সেই অনিন্দ্যসুন্দর মাতৃমুখ হইতে সদ্যোবিকশিত গোলাপ সদৃশ শিশুর মুখের প্রতি তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া রহিল। রাধারাণী নিস্তব্ধ। বিজ্‌লী নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত প্রসারিত করিয়া শিশুকে কোলে টানিয়া লইয়া, সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রাধারাণী কহিল, চিনেচ দিদি ?

চিনেচি বোন।

রাধারাণী কহিল, দিদি, সমুদ্র-মন্থন ক'রে বিষটুকু তার নিজে খেয়ে সমস্ত অমৃতটুকু এই ছোট বোনটিকে দিয়েচ! তোমাকে ভালবেসেছিলেন ব'লেই আমি তাঁকে পেয়েচি।

সত্যেন্দ্রর একখানি ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ হাতে তুলিয়া লইয়া বিজ্‌লী একদৃষ্টে দেখিতেছিল, মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, বিষের বিষই যে অমৃত বোন? আমি বঞ্চিত হইনি ভাই! সেই বিষই এই ঘোর পাপিষ্ঠাকে অমর করেচে।

রাধারাণী সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল, দেখা কর্‌বে দিদি?

বিজ্‌লী এক মুহূর্ত্ত চোখ বুজিয়া স্থির থাকিয়া বলিল, না দিদি। চার বছর আগে যে দিন তিনি এই অস্পৃশ্যটাকে চিন্‌তে পেরে বিষম ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেলেন, সেদিন দর্প ক'রে বলেছিলুম, আবার দেখা হবে, আবার তুমি আস্‌বে; কিন্তু, সেই দর্প আমার রইলো না, আর তিনি এলেন না; কিন্তু, আজ দেখ্‌তে পাচ্ছি, কেন দর্পহারী আমার সে দর্প ভেঙ্গে দিলেন! তিনি ভেঙ্গে দিয়ে যে কি ক'রে গড়ে দেন, কেড়ে নিয়ে যে কি ক'রে ফিরিয়ে দেন, সে কথা আমার চেয়ে আর কেউ জানে না বোন! বলিয়া সে আর একবার ভাল করিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, প্রাণের জ্বালায় ভগবানকে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ব'লে অনেক দোষ দিয়েচি, কিন্তু, এখন দেখতে পাচ্ছি, এই পাপিষ্ঠাকে তিনি কি দয়া করেচেন! তাঁকে ফিরিয়ে এনে দিলে, আমি যে সব দিকে মাটি হয়ে যেতুম! তাঁকেও পেতুম না, নিজেকেও হারিয়ে ফেল্‌তুম!

কান্নায় রাধারাণীর গলা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে কিছুই বলিতে পারিল না। বিজ্‌লী পুনরায় কহিল, ভেবেছিলুম, কখনও দেখা হ'লে তাঁর পায়ে ধ'রে আর একটিবার মাফ চেয়ে দেখব ; কিন্তু তার আর দরকার নেই। এই ছবিটুকু শুধু দাও দিদি—এর বেশী আমি চাইনে। চাইলেও ভগবান তা সহ্য কর্‌বেন না—আমি চল্‌লুম, বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাধারাণী গাঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, আবার কবে দেখা হবে দিদি ?

দেখা আর হবে না বোন। আমার একটি ছোট বাড়ী আছে, সেইটে বিক্রী করে যত শীঘ্র পারি চলে যাব। ভাল কথা, বলতে পার ভাই, কেন হঠাৎ তিনি এতদিন পরে আমাকে স্মরণ করেছিলেন ? যখন তাঁর লোক আমাকে ডাক্‌তে যায়, তখন কেন একটা মিথ্যে নাম বলেছিল ?

লজ্জায় রাধারাণীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, সে নতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

বিজ্‌লী ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল, হয়ত বুঝেচি। আমাকে অপমান কর্‌বেন ব'লে ? না ? তা ছাড়া এত চেষ্টা ক'রে আমাকে আন্‌বার ত কোন কারণ দেখিনে।

রাধারাণীর মাথা আরও হেঁট্ হইয়া গেল। বিজ্‌লী হাসিয়া বলিল, তোমার লজ্জা কি বোন ? তবে তাঁরও ভুল হয়েচে। তাঁর পায়ে আমার শত কোটি প্রণাম জানিয়ে বোলো সে হবার নয়। আমার নিজের ব'লে আর কিছু নেই। অপমান কর্‌লে, সমস্ত অপমান তাঁর গায়েই লাগবে।

নমস্কার দিদি !

নমস্কার বোন ! বয়সে ঢের বড় হ'লেও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবার অধিকার ত আমার নেই—আমি কায়মনে প্রার্থনা করি বোন, তোমার হাতের নোয়া অক্ষয় হোক্—চল্লুম ।

সমাপ্ত
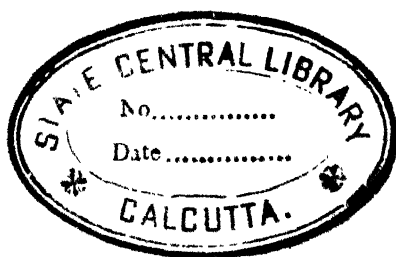
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬